স্বস্তিকা

দাম : ষোলো টাকা

অধুনালুপ্ত সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতা এবং অন্তঃসলিলা সরস্বতী নদী ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্বের নিদর্শন— পৃঃ ২৭

বেদ-পুরাণে সরস্বতী— পৃঃ ৩১

৭৭ বর্ষ, ২২ সংখ্যা।। ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫।। ২০ মাঘ, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৬।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, **SMS 'PLY'** to **54646** or call us on **1800-2000-440** or give a missed call on **080-1000-5555**

E-mail: **kolkata@centuryply.com** | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: **www.centuryply.com**

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৭ বর্ষ ২২ সংখ্যা, ২০ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

৩ ফেব্রুয়ারি - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৬,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

সিবিআইয়ের প্রথম রিপোর্টে কাদের নাম দেখে চমকে উঠেছিল সুপ্রিম কোর্ট? লজ্জাবাজার

◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

দিদির রাজ্যে সবই বৈধ ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

যুবশক্তি এবং বিকশিত ভারত ◻ অমোল পেডণেকর ◻ ৮

ইউনুস জমানায় ক্রমশ ঋণের ফাঁদে জড়াচ্ছে বাংলাদেশ : হাত পাতছে চীনের কাছে ◻ **বিশ্বামিত্র** ◻ ১০

সংবিধানে ভারতের জাতিভিত্তিক সংরক্ষণ একটি পর্যালোচনা ◻ ড. চন্দ্রশেখর মণ্ডল ◻ ১১

জাতিগত জনগণনার দাবি আসলে ভারত ভাঙার চক্রান্ত

◻ ডাঃ সুকুমার মণ্ডল ◻ ১৩

মহাকুম্ভের আয়োজনে যোগীকে ‘সনাতনাদিত্য’ আখ্যা দিলেন জুনা আখড়ার পীঠাধীশ্বর ◻ দুর্গাপদ ঘোষ ◻ ১৫

নদী থেকে দেবী ◻ অভিরূপ গঙ্গোপাধ্যায় ◻ ২৩

সরস্বতী মন্দির ও মূর্তির ইতিকথা ◻ সোমকান্তি দাস ◻ ২৪

অধুনালুপ্ত সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতা এবং অন্তঃসলিলা সরস্বতী নদী ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্বের নিদর্শন

◻ অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায় ◻ ২৭

বেদ-পুরাণে সরস্বতী ◻ নন্দলাল ভট্টাচার্য ◻ ৩১

মহাবিদ্যা সরস্বতী ◻ ড. সর্বাণী চক্রবর্তী ◻ ৩৫

অপারেশন মরিচঝাঁপি—সিপিএমের এক কলঙ্কিত অধ্যায়

◻ অধ্যাপক গোপাল চক্রবর্তী ◻ ৪৩

অভয়ার বাবা-মায়ের মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চাওয়া কী অন্যায়?

◻ বিশ্বপ্রিয় দাস ◻ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ :

◻ চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ৩৬-৩৯ ◻ খেলা : ৪৪ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৬-৫০

ফঃ ১

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

প্রকাশিত হবে ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ

তিনি হিন্দু জাতিকে 'আমি হিন্দু আমি হিন্দু' জপ করতে বলেছিলেন। তিনিই হিন্দুদের জন্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে রাজনৈতিক নেতা রূপে নির্দিষ্ট করে গিয়েছেন। আগামী মাঘী পূর্ণিমায় তাঁর আবির্ভাব তিথি।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় যুগচার্য স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে স্বস্তিকা পত্রিকা তাঁর হিন্দু জাতি গঠনের কর্মময় জীবনের ওপর আলোকপাত করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(যারা ডাকযোগে স্বস্তিকা নিচ্ছেন তাদের জন্য)

যাঁরা শুধুমাত্র ৭০০ টাকা দিয়ে বার্ষিক গ্রাহক হচ্ছেন তাঁদের স্বস্তিকা সাধারণ ডাকের মাধ্যমে নিয়মিত পাঠানো হচ্ছে। এক্ষেত্রে অনেকেই অভিযোগ করছেন ডাকবিভাগ ঠিকমতো তাঁদের স্বস্তিকা সরবরাহ করছে না। এই কারণেই দু'টি বিশেষ প্রকল্প শুরু করা হয়েছে, যাতে ডাকযোগের গ্রাহকরা নিশ্চিতরূপে তাঁদের স্বস্তিকা পেতে পারেন।

১০৬০ টাকার বিনিময়ে (গ্রাহক মূল্য ৭০০ + ৩৬০ রেজিস্ট্রি খরচ) বার্ষিক গ্রাহক করার একটি প্রকল্প শুরু করা হয়েছে, যাতে স্বস্তিকা নিশ্চিতভাবে গ্রাহকের হাতে পৌঁছায়। এক্ষেত্রে প্রতি মাসের পত্রিকা একত্রে একবার রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

১৫৫০ টাকার বিনিময়ে (গ্রাহকমূল্য ৭০০ + ৮৫০ রেজিস্ট্রি খরচ) বার্ষিক গ্রাহক করার আরও একটি প্রকল্প শুরু করা হচ্ছে, যাতে গ্রাহক তাদের স্বস্তিকা রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রতি সপ্তাহে নিশ্চিতভাবে পেতে পারেন।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বিদ্যাদেবী মা সরস্বতী

মাঘী শুক্লা শ্রীপঞ্চমী তিথি হইল দেবী সরস্বতীর আরাধনায় রত হইবার সময়। বিশিষ্ট ঐতিহাসিকগণের গবেষণায় পরিষ্কার যে বিশ্বের মানব সভ্যতার মূলকেন্দ্র ভারতবর্ষ। সেই ভারতভূমিতে একদা প্রবহমান ছিল বেগবতী সরস্বতী নদী। নদীতীরবর্তী অঞ্চলসমূহের মৃত্তিকা ছিল উর্বর। নদীতীরে ছিল জীবনধারণের অনুকূল পরিবেশ। প্রাচীন ঋষিগণ সরস্বতী নদীকূলের তপোবনে স্থাপন করিয়াছিলেন তাঁহাদের আশ্রম। সেই পবিত্র তপোভূমি হইতে ঋষিগণের কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছিল মহা ওঙ্কারধ্বনি, ধ্বনিত হইয়াছিল বেদমন্ত্র। সরস্বতী নদীতীরে ঋষিগণ কর্তৃক স্থাপিত জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরবর্তী অধ্যায়ে এই নদীর অববাহিকায় বিকশিত হয় বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতা। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অংশে বহু সহস্রাব্দ ধরিয়া বিরাজমান সারস্বত সভ্যতা সাম্প্রতিক অতীতে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের মাধ্যমে আবিষ্কৃত হইয়াছে। একদা কালের গর্ভে অন্তর্হিত সেই সকল প্রাচীন জনপদ ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্বের নিদর্শন বহন করিতেছে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে নদ-নদীসমূহকে দেব-দেবীজ্ঞানে পূজার বিধি ও পরম্পরা বর্তমান। ঋগ্বেদোক্ত নদী সরস্বতীই কালক্রমে দেবীতে রূপান্তরিত হইয়াছেন। বর্ণিত হইয়াছে 'নদীতমে অম্বিতমে'। বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্তদায়িনী দেবী সরস্বতী। ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বিদ্যা ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী। নালন্দা-তক্ষশীলার ন্যায় বহু বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বজুড়ে জ্ঞানের প্রভা বিচ্ছুরণ করিয়াছে। বৌদ্ধ মতাবলম্বীদিগের দ্বারা তিনি দেবী প্রজ্ঞাপারমিতা রূপে পূজিতা। তিব্বত, চীন ও জাপানে দেবী সরস্বতী যথাক্রমে ইয়াং চেন মা, মিয়াওয়িন মু এবং বেঞ্জাইতেন নামে পূজিতা। জ্ঞানদায়িনী দেবীর আশীর্বাদে জাপানিরা আজ প্রযুক্তি বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। জাপানে বিদ্যাদেবীর অসংখ্য মন্দির রহিয়াছে। ভারতীয় উপমহাদেশ ব্যতীত এশিয়া মহাদেশের বহুলাংশে, বিশেষত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিভিন্ন নামে দেবী সরস্বতী পূজিত হইতেছেন। মায়ানমার, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া-সহ ইওরোপের গ্রিস, ইতালিতে কোথাও তিনি দ্বিভুজা, কোথাও চতুর্ভুজা। শাস্ত্রোক্ত ধারণানুযায়ী, শব্দই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের প্রকাশস্বরূপ শব্দাবলীর মাধ্যমে গঠিত হয় একটি বাক্য। কতিপয় বাক্যের সমন্বয়ে আবির্ভূত হয় একটি সূত্র। কতিপয় সূত্র স্থাপন করে একটি তথ্য। কয়েকটি তথ্যের সমভিব্যহারে আবির্ভূত হয় একটি তত্ত্ব। অগণিত তত্ত্ব একটি সত্যের আকার ধারণ করিয়া থাকে। এই শব্দ অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে সত্যে উপনীত হইবার চিরন্তন ধারায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইল বাক্য। এই বাক্যদায়িনী দেবী, অথবা বাগ্দেবীই হলেন শ্রীশ্রীচণ্ডী বর্ণিত দেবী মহাসরস্বতী।

পূজা শব্দের অর্থ শ্রদ্ধা নিবেদন। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কিংবা দেবদেবীর সম্মুখে আনতমস্তকপূর্বক তাঁদের উপাসনা ও আরাধনার দ্বারা পূজার উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে। দেবদেবীগণ ঈশ্বরীয় গুণ বা শক্তির প্রকাশ। দেবী সরস্বতীর আরাধনাহেতু আয়োজিত মহতী অনুষ্ঠানই সরস্বতী পূজা। সাম্প্রতিক অতীতে বিশেষ স্বার্থান্বেষী মহলের প্রকোপে, শ্রীপঞ্চমী তিথিতে মা সরস্বতীকে আরাধনার পবিত্র উদ্দেশ্যকে কলুষিত করিবার লক্ষ্যে একটি বিশ্ববাণিজ্যিক চক্রান্তপ্রসূত প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। কিশোর-কিশোরী এবং তরুণ-তরুণীরা ইহার মূল লক্ষ্যবস্তু। এই স্বার্থান্বেষী মহল সরস্বতী পূজার দিবসটিকে বঙ্গীয় ভ্যালেন্টাইন ডে বা প্রেমদিবস আখ্যাদানের পক্ষপাতী। বলা বাহুল্য যে, তাহাদের এহেন অপপ্রচার সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় সংস্কৃতি ও পরম্পরা-বিরোধী। যেনতেনপ্রকারেণ সরলমতি নিষ্পাপ প্রাণগুলির চিত্তে বিভ্রান্তি সৃষ্টিপূর্বক তাহাদের বিপথে পরিচালনার দ্বারা ব্যাপক মুনাফা অর্জনই এই চক্রান্তকারীদের লক্ষ্য। পরিতাপের বিষয় যে,আধ্যাত্মিক ভূমি ভারত স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী পর্যায়ে পর্যবসিত হইয়াছে ধর্মনিরপেক্ষ দেশে। ইহার বলেই ভোটভিখারি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরস্বতী বন্দনার বিরোধিতা করিয়া থাকে। শিল্পীর স্বাধীনতার নামে তাহারা বিকৃত সরস্বতী চিত্রাঙ্কনকে সমর্থন করিয়া থাকে। উপাসনাপদ্ধতি ভিন্ন হইলেও বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী তথা ভারতের পূর্বতন রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালাম মা সরস্বতীর আরাধনা করিতেন। কারণ তিনি বিদ্যার দেবী। কোনো বিশেষ জাতি অথবা সম্প্রদায়ের নহে। বিদ্যালয়ে মা সরস্বতী আরাধনার বিরোধিতা অথবা সরস্বতী চিত্রের বিকৃতীকরণ একপ্রকার জেহাদি ও ঔপনিবেশিক মানসিকতা মাত্র। দেশের স্বাধীনতা অর্জন এবং স্ব-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর ৭৫ বৎসর অতিক্রান্ত। এই অমৃতকালে জেহাদি ও ঔপনিবেশিক মানসিকতাকে দূরীভূত করিতে, সর্বপ্রকার ভারত-বিরোধী ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করিতে দেশের প্রবুদ্ধ সমাজের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ বিশেষ প্রয়োজন।

সুভাষিতম্

অপূর্বঃ কোঽপি কোষোঽয়ং বিদ্যতে তব ভারতী।
ব্যয়তো বৃদ্ধিমায়াতি ক্ষয়মায়াতি সঞ্চয়াৎ।।

হে মা সরস্বতী! তোমার কাছে এক অপূর্ব ভাণ্ডার রয়েছে, যা ব্যয় করলে বৃদ্ধি হয় আর সঞ্চয় করলে ক্ষয় হয়।

সিবিআইয়ের প্রথম রিপোর্টে কাদের নাম দেখে চমকে উঠেছিল সুপ্রিম কোর্ট?

লজ্জাবাজার

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

রহস্যটা থেকে গিয়েছে। সে পর্দা ফাঁস হবে? এ রাজ্যে বিচারের বাণীর যাতে নীরব মৃত্যু হয়, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তা নিশ্চিত করেছেন। এখনো জানা যায়নি সিবিআইয়ের প্রথম রিপোর্টে কাদের নাম ছিল যা দেখে সুপ্রিম আদালতের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের তিন বিচারক চমকে উঠেছিলেন। সে নামের তালিকায় উপরদিক থেকে মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে সচিব পর্যায়ের রাঘববোয়াল আর পুলিশ কর্তাদের নাম থাকলেও থাকতে পারে অথবা এমন কোনো নাম থাকতে পারে যাদেরকে বিচারপতিরা পদভারে চেনেন। হলফ করে বলতে পারি এই মামলায় আপাতত যে মনুষ্যরূপ পশুটির শাস্তি হয়েছে বিচারপতিরা তাকে চেনেন না আর তার নাম দেখেও চমকে ওঠেননি। তারপরই বিচারপতিরা জানিয়েছিলেন, তদন্ত শেষ করতে তারা সিবিআই-কে সময় দিতে চান।

ছ' মাসের ব্যবধানে সিবিআইয়ের প্রথম অনুসন্ধান আর চার্জশিটের বয়ান কিংবা আদালতে তাঁদের তদন্তকারী অফিসার সীমা পাহুজার বয়ানে বিস্তর ফারাক রয়েছে। সিবিআই-কে প্রমাণ করতে হবে যে তারা আন্তরিকভাবেই এই তদন্ত চালিয়ে কেবল একজনকেই দোষী পেয়েছে। সেই দোষীকে গ্রেপ্তার করে রাজ্য সরকার সিবিআইয়ের হাতে দিয়েছিল সে তখন কেবল একমাত্র দোষী ছিল না যা সিবিআই এখন বলছে। তাহলে এই ঘৃণ্য কর্মের আড়ালে যারা ছিল তারা কোথায়? পাহুজা অস্বীকার করেছেন যে প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করতেই একজনকে দোষী সাজানো হয়েছে। তিনি কলকাতা পুলিশের তদন্ত কোনোভাবেই অনুসরণ করেননি। সেমিনার রুম ঘটনাস্থল ছিল। অন্য কোনো জায়গা নয়। ইতিমধ্যে অভয়াকাণ্ডে যুক্ত প্রথম পশুটির যাবজ্জীবন সাজা হয়েছে। ঘৃণায় তার নাম লিখছি না। শিয়ালদহ আদালতে সে জানিয়েছে যে অপরাধ স্বীকার করলে 'সব ম্যানেজ' করা হবে বলে তাকে ঘরে ডেকে চাপ দিয়েছিল স্বয়ং পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল আর ডিসি (স্পেশ্যাল)। সে বয়ান লিপিবদ্ধ করেছেন বিচারপতি অনির্বাণ দাশ।

দোষী সাব্যস্ত হলে অপরাধীর কোনো কথা গৃহীত হয় না। তবু সাংবাদিককে সব ছাই উড়িয়ে দেখতে হবে। দোষীর বিস্তারিত বয়ান সর্বত্র প্রকাশিত হয়েছে। তাকে একশোটির উপর প্রশ্ন করে অর্ধেকের কম উত্তর পাওয়া গিয়েছে। বহু কিছুই চাপা পড়ে রয়েছে তথ্য বিকৃতি আর লোপাটের আড়ালে। উভয় ক্ষেত্রেই তার দায় যেমন নিতে হবে পুলিশমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে তেমন কলকাতা পুলিশে সদর কার্যালয়কেও। তদন্তকারী সিবিআই অফিসার জানিয়েছেন তদন্তের কাজ তারা করেছেন টালা থানার দেওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে। প্রতিটি পদক্ষেপে অভয়ার ধর্ষণ হত্যার তথ্য লোপাটের যে অবৈধ চেষ্টা পুলিশ করেছে তা বিচারপতি দাশ তার ১৭২ পাতার রায়ে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন।

> **একসময় পৃথিবী বিখ্যাত স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে তুলনা চলত কলকাতার পুলিশ সদর লালবাজারের। আজ তার নাম লজ্জাবাজার। কে তার কারিগর?**

কিন্তু 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনি'। সে অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে মমতা ব্যার্জি নতুন করে নজর ঘোরানোর খেলায় নেমেছেন। দোষীর ফাঁসি চেয়েছেন। এ নাটক যেমন মিথ্যায় ভরা ছিল, চিকিৎসকদের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের নাটকও তেমন। এক তৃণমূলের নেতা প্রতিবেদককে বলেছেন, 'দিদিমণি গোটা মামলা হাইজ্যাক করতে চান যাতে ২০২৬-এর ভোটে বিরোধীরা তাকে আক্রমণ না করতে পারে।' ছেঁদো চালাকিতে ফাঁপরে পড়েছেন শহরের পুলিশ কর্তারা। একে তো বিচারপতি দাশ তাদের তথ্য লোপাটের অবৈধ কারবারী বলেছেন। প্রকাশ্যে তুলে ধরেছেন তারা কীভাবে অভয়ার বিচার আটকেছে। আমার মতে তাকে নতুন করে খুন করেছে।

পাশাপাশি পুলিশমন্ত্রী তাদের চূড়ান্ত লজ্জায় ফেলেছে। অভয়ার খুন-ধর্ষণের প্রকৃত তথ্য যাতে না পাওয়া যায় তার জন্য তিনি পুলিশকে ব্যবহার করেছিলেন। তাই এই মামলার 'মূল প্রমাণ অভয়ার মৃতদেহ তড়িঘড়ি পুড়িয়ে ফেলা হয়।' পুলিশের কাছে এটা লজ্জার যে তথ্য লোপাটের মূল কারিগর দোষীর শাস্তি চেয়ে ফাঁসির আবেদন করছেন। দেহ পুড়িয়ে ফেলায় মমতা আর তার পুলিশ হাঁফ ছেড়েছে। ফাঁকফোঁকর গলে একটি পশুর ফাঁসি হয়নি। তবে তদন্তে নেমে একটু বেকায়দায় পড়েছে সিবিআই। তারা বুঝতে পারেনি মমতার পুলিশ কত উচ্চ মাত্রার দুর্নীতিতে অভ্যস্ত। একসময় পৃথিবী বিখ্যাত স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে তুলনা চলত কলকাতার পুলিশ সদর লালবাজারের। আজ তার নাম লজ্জাবাজার। কে তার কারিগর? কিছু পদলোভী আর পদলেহী পুলিশকর্তা না কি পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? কে হারাল মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা? মমতা না পুলিশ? □

দিদির রাজ্যে সবই বৈধ

প্রশ্রয়দাত্রীষু দিদি,

অনেকে অনেক কথা বললেও নিজের মতোই চলবেনা। ভাইয়েদের কথা বেশি ভাববেন। সেটাই দরকার। বৈধ বা অবৈধ বলে কিছু হয় না। এটা আমি বলছি দিদি। আপনার ভাই হিসেবে বলছি। যদিও নীতি মেনে বলতে হয়, কোনো অবৈধ ব্যবস্থা চালু থাকলে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রশাসনের কর্তব্য। রাজ্যের শাসক হিসেবে আপনি বিলক্ষণ সে কথা জানেন। সম্প্রতি হাওড়া জেলা প্রশাসনের কঠোর সিদ্ধান্তে সেখানে রাস্তায় দাপিয়ে বেড়ানো অবৈধ টোটোর দিনও নাকি ফুরোল। কিন্তু ফুরোল না। সেই টোটোগুলিকে নথিভুক্ত করা হবে এবং তাদের 'বৈধ' করে তোলা হবে। ব্যাস, অবৈধ টোটোর সমস্যার একেবারে মৌলিক সমাধান। সবাই এর সমালোচনা করছে। আমি কিন্তু এর পক্ষে দিদি। যেহেতু এই পেশার সঙ্গে বহু মানুষের রুজিরোজগার জড়িত, তাই এই টোটো বন্ধ করা হবে না। আর দিদি, বড়ো কথা হলো এরা সকলেই তৃণমূলের লোক।

এই একই কথা হকারদের এবং রাজ্যের আরও অনেক ক্ষেত্রে নানাভাবে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। যেমন, পুরসভার অনুমোদিত 'প্ল্যান'-এর তোয়াক্কা না করে যথেচ্ছ বহুতল নির্মাণের পর সামান্য জরিমানা দিয়ে তাকে 'বৈধ' করে নেওয়া হয়। ফুটপাত দখল করে হকার বসিয়ে দেওয়ার পর মানবিকতার স্বার্থে তাকেও মেনে নেয় প্রশাসন। এমনকী, তটভূমি সংক্রান্ত আইনি নির্দেশিকাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে তৈরি হওয়া হোটেলও ভাঙা যায় না, কারণ এই রাজ্যে 'বুলডোজার রাজ' চলবে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন আপনি। মন্দারমণির কথা বলছি দিদি। আমি সমর্থন করি। যোগীর রাজ্য আর দিদির রাজ্যে তবে আর ফারাক কোথায় হবে!

মানুষের কথা মানে ভাইদের কথা দিদি ভাববেন না তো কে ভাববেন? দলের নেতাদের উপায় নেই, কারণ এই মানুষই ইভিএম-এর বোতাম টেপেন। রাজনীতিতে তাই অবৈধকে বৈধ করে তোলার প্রক্রিয়াই বৈধ। সবাই বলে, শাসকদলের স্থানীয় নেতার দরবারে প্রণামি দিলে সেই অবৈধ কাজ শুরু করার অনুমতি মেলে এবং পরে রাজ্য প্রশাসন মানবিকতার স্বার্থে তাকে মেনে নেয়। এই ব্যবস্থার কথা রাজ্যবাসীও বিলক্ষণ জানেন। ফলে, রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তেই নিয়মিত এমন কার্যকলাপ চলতেই থাকে। এবং চলবে। সরকার মা, মাটি, মানুষের। অবৈধ কাজ করলেও তৃণমূলি মানেই বৈধ। লকারে মাদক লুকিয়ে রাখলেও। কোটি কোটি টাকায় চাকরি বিক্রি করলেও।

> **"যে রাস্তায় মোটর যান চলাচল করে, সেখানে টোটো নিষিদ্ধ করা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সে পথে হাঁটবে না। টোটো চলবে। যেমন খুশি চলবে। দিদির ভাইয়েরা চালাবে। চালাবেই।"**

তবে দিদি, টোটো বস্তুটি এক নাগরিক বিভীষিকা। আপনি তো গাড়িতে ঘোরেন তাই বুঝবেন না। টোটোর ধর্মই হলো 'যেমন খুশি চলো'। টোটোগুলি এই কথাটিকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেছে— তারা সত্যিই যেমন খুশি চলে। ফলে, পাড়ার গলি থেকে জাতীয় সড়ক, সর্বত্রই তাদের অবাধ বিচরণ। রাস্তায় ভুল দিকে চলা; 'নো এন্ট্রি'-র পরোয়া না করা; যে ফাঁকে সুচ গলে না সেখান দিয়েই গলে যাওয়ার আত্মবিশ্বাস বজায় রাখা; এবং আশেপাশে দাঁড়িয়ে বা চলতে থাকা গাড়ির গায়ে নিজেদের স্বাক্ষর রেখে যাওয়া, এ সবই পশ্চিমবঙ্গের টোটোদের স্বভাবধর্ম। তাদের অনাচার দেখেও চুপ করে থাকাই দস্তুর, কারণ কে না জানে, তাদের মাথায় কার আশীর্বাদ হাত রয়েছে। অতএব, টোটোর দৌলতে নিত্য যানজট, নিত্য বিশৃঙ্খলা। বিশেষত হাওড়ার মতো শহরে সে সমস্যা ভয়ংকরতর, কারণ ঐতিহাসিক ভাবেই সেখানকার রাস্তা সরু। এই সমস্যার সমাধান সহজ— যে রাস্তায় মোটর যান চলাচল করে, সেখানে টোটো নিষিদ্ধ করা।

কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি, পশ্চিমবঙ্গ সে পথে হাঁটবে না। টোটো চলবে। যেমন খুশি চলবে। দিদির ভাইয়েরা চালাবে। চালাবেই। □

অতিথি কলম

অমোল পেডণেকর

যুবশক্তি এবং বিকশিত ভারত

বিপুল যুবশক্তি আমাদের দেশের জন্য এক স্বর্ণময় অধ্যায়

বয়সের ৫০-৬০ বছরের গণ্ডিতে পৌঁছানো আমাদের প্রজন্ম নানান পরিবর্তনের সাক্ষী থেকেছে, যার মধ্যে টেলিফোনের জন্য ট্রাঙ্ককল বুক করা, বুথ থেকে ফোন করা, পেজারের মাধ্যমে খবর পাঠানো, মোবাইল ফোনে ইনকামিং কলের জন্য পয়সা খরচ করাও দেখেছি। এখন আমরা হাতের মধ্যে ছোট্টো কম্পিউটারের মতো স্মার্ট ফোন ব্যবহার করছি। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ জীবনের অনুভব নিচ্ছি। বর্তমান যুব প্রজন্ম Gen Z রূপে পরিচিত। Gen Z-এ তারাই রয়েছে যাদের জন্ম ১৯৯৭ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে হয়েছে। এটি সেই প্রজন্ম যাদের জন্মের দু'বছরের মধ্যেই মোবাইল ফোন আর তার পরেই স্মার্ট ফোন চলে আসে। মোবাইল ফোন, স্মার্ট ফোন এবং সামাজিক মাধ্যমের ছত্রছায়ায় বেড়ে উঠেছে এই প্রজন্ম। বিগত ২৫-৩০ বছরে সমাজে ১৮০ ডিগ্রি পরিবর্তন হয়ে গেছে। শুধু ভারতে নয় বরং সমগ্র বিশ্বে এই পরিবর্তন বৌদ্ধিক জগৎ-সহ সমস্ত ক্ষেত্রেই ঘটেছে। পরিবর্তনের এই ধারা আদিকাল থেকেই চলে আসছে, কিন্তু এই পরিবর্তন বর্তমান বিশ্বে বিস্ময় সৃষ্টিকারী।

ভারত যুব প্রতিনিধির দেশ। এই প্রচলিত কথাটি এখন স্বাভাবিক একটা কথা হয়ে উঠেছে। কিন্তু বাস্তবে 'যুব' কথাটার অর্থ কী? ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সিদের যুব বলা হয়। ভারতের জনসংখ্যার ২২ শতাংশই ১৮ থেকে ২৯ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ ২৬ কোটি লোক যুব প্রজন্মের। এই বিশাল জনশক্তি থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশের আধার কী তা বুঝতে হবে, কেননা যুব প্রজন্মই দেশের শক্তি তথা ভবিষ্যৎ। ভারত বিশ্বের সবচেয়ে যুব দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। এটি স্থায়ীরূপে প্রাপ্ত কোনো সুযোগ নয়, এই কারণে যুব প্রজন্মকে বিকাশ ও অভিজ্ঞতা অর্জনে উৎসাহ প্রদান করা আগামী দশকের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই সুযোগের লাভ নেওয়ার জন্য যুবপ্রজন্মকে একটি সমাজরূপে আমাদের উপলব্ধির বিস্তার ঘটানোর প্রয়োজন রয়েছে। যুবাবস্থার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ কী কী? যুবপ্রজন্মের সামনে মূল প্রশ্ন কী রয়েছে? তাদের মনে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কী জিজ্ঞাসা রয়েছে? যদি আমরা তাদের মানসিক অবস্থার প্রতি নজর দিই তো দেখতে পাবো যে, যুবসমাজ আত্মবিকাশ ও সামাজিক অংশগ্রহণ চায় এবং যারা নবনির্মাণের মতো কাজে অংশ নিতে চায়, তাদের মনে কী ধরনের প্রশ্ন, কী ধরনের বিভ্রান্তি এবং কী লক্ষ্য রয়েছে? যখন এই সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে একসঙ্গে চিন্তাভাবনা করা হয় তখন সবচেয়ে বেশি জিজ্ঞাস্য হলো সামাজিক ও জাতীয় বিকাশে যুবদের ইতিবাচক অংশগ্রহণ কীভাবে বাড়তে পারে? বাস্তবে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মধ্যে একটি এবং ১৮ থেকে ২৯ বছরের 'ক্রমোন্নত বয়স'-এর আয়ু, যা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সবচেয়ে উপযুক্ত। বিজ্ঞান মতে যুবাবস্থাতে মস্তিষ্কের বিকাশ অব্যাহত থাকে এবং জীবন, সৃষ্টি ও নিজ অস্তিত্বের বিষয়ে গভীর প্রশ্ন যুব প্রজন্মের মনে অহরহ উঠতে থাকে।

আমাদের অধিকাংশ কলেজ শিক্ষা প্রচুর তথ্যজ্ঞান প্রদান করে, কিন্তু একটা শিক্ষা যা কেউই পায় না তা হলো 'উদ্দেশ্য'। যখন লক্ষ্য স্পষ্ট থাকে না, তখন যুবপ্রজন্ম ভুল ধারণা, মিথ্যা প্ররোচনার ফাঁদে পড়ে যায়। তাই কখনো কখনো আমাদের কলেজ ছাত্রদের কোনো বিষয়ের গভীরে গিয়ে অনুসন্ধান করা, কোনো প্রশ্নের দ্রুত সমাধান করা কঠিন হয়ে পড়ে। বাস্তবে উদ্দেশ্যহীন জীবন অন্তঃসারশূন্য। জীবনের উদ্দেশ্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে একটি। যুব প্রজন্মের মধ্যে উদ্যমশীলতা প্রচুর, কিন্তু লক্ষ্যের প্রতি নিবিষ্ঠতা কম।

আমাদের দেশে যুব প্রজন্মের বিকাশের জন্য পর্যাপ্ত পরিকল্পনা হচ্ছে না। তাদের শুধুমাত্র ভোটার বা রোজগার যোজনায় লাভার্থী রূপে দেখা হয়। অপরদিকে নিজ এলাকায় যুবদের প্রতি দৃষ্টিকোণ গ্রাহক হিসেবেই সীমাবদ্ধ। সব মিলিয়ে আমাদের কাছে যুব-বিকাশের জন্য কোনো নির্ভরযোগ্য পরিকল্পনা নেই। এর জন্য অনেক প্রশ্ন ওঠে এবং অস্পষ্টতা থেকে যায় যে, বাস্তবে যুব প্রজন্মের সঠিক বিকাশ কীভাবে সম্ভব? কীভাবে বোঝা সম্ভব যে তাদের মধ্যে বিবিধ ক্ষমতার বিকাশ হচ্ছে কিনা। এই অস্পষ্টতার ফলস্বরূপ পরীক্ষায় কত পেল, ডিগ্রি, রোজগার, বেতন, বাড়ি-গাড়ি এই সবই গুরুত্ব পাচ্ছে। যুব-বিকাশ সম্পর্কে আমাদের অধিকাংশ কথাবার্তা ও আলোচনায় আত্মহত্যা, কর্মহীনতা, দুর্ঘটনা, যৌন নিগ্রহ, মাদকাসক্ত, মোবাইল ফোনের অধিকাধিক ব্যবহার — এই সবের মধ্যেই ঘোরাঘুরি করে। এই বিন্দুগুলি থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের যুব প্রজন্মের বিকাশের স্থায়ী কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। ইতিবাচক বিকাশের অসংখ্য সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সম্ভাবনাগুলিকে বাস্তবরূপ প্রদান যুব প্রজন্ম এবং বাকি সকলের দায়িত্ব। কারণ প্রগতিশীল যুবসমাজই সমৃদ্ধ ভারতের সমৃদ্ধির ইঞ্জিন।

১২ জানুয়ারি ভারত সংস্কৃতির ঘনীভূত রূপ বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী। ১৮৯৩ সালে শিকাগো বিশ্বধর্ম

সম্মেলনে বিশ্ব বন্ধুত্বের বার্তা দিয়ে তিনি বিশ্বে হিন্দু সংস্কৃতির বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। যুব প্রজন্মের জন্য স্বামীজীর বাণী ছিল 'যতক্ষণ না পর্যন্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছ, ততক্ষণ থেমো না।' স্বামী বিবেকানন্দ বর্তমান প্রজন্মের জন্য প্রেরণা তথা যুব প্রজন্মের আদর্শ। তাঁর জীবনের প্রেরণাদায়ী প্রসঙ্গ থেকে রাষ্ট্র নির্মাণের কাজে যুব প্রজন্মের অংশগ্রহণের বিষয়ে সর্বদা চিন্তন-মন্থন হওয়া উচিত।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর বক্তব্যে সবসময়ই যুব প্রজন্মের কথা উল্লেখ করেন। যুব প্রজন্মই এই দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। ভারতের ৬৫ শতাংশ জনসংখ্যা ৩৫ বছরের কম বয়সের, যা পৃথিবীর অন্য দেশের তুলনায় অনেকটাই পার্থক্য তৈরি করে। যদি এই প্রজন্ম সঠিক দিশানির্দেশ পায় তবে তাদের অংশগ্রহণ বাড়বে এবং তারা উপযুক্ত গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হবে। যুবসমাজ আমাদের দেশের মেরুদণ্ড। যুবসমাজ সর্বদাই পরিবর্তন, প্রগতি ও সৃজনশীলতার সঙ্গে অগ্রসর হয়। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে এই প্রজন্মের যোগদানই সবচেয়ে বেশি ছিল। ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই উৎসাহী তরুণ প্রজন্ম তাদের তারুণ্যের শক্তিতে বীরত্বের সঙ্গে শত্রুদের পরাজিত করেছে। মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র, যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ, মহর্ষি দয়ানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, লোকমান্য তিলক, বীর সাভারকর, গান্ধীজী, সুখদেব-রাজগুরু-ভগৎ সিংহ, বিনয়-বাদল-দীনেশ, ড. আম্বেদকর, ডাঃ হেডগেওয়ার এমন অজস্র উদাহরণ আমরা জানি। তাঁরা নিজেদের যুবাবস্থাতেই দেশকে নতুন পথের সন্ধান দিতে সর্বোৎকৃষ্ট প্রয়াস করে গেছেন। বর্তমান প্রজন্ম নতুন বিচারধারা ও আধুনিকতার মেলবন্ধনে অগ্রসর হচ্ছে। আজকের যুবা আগামীর দিশা ও দশা নিশ্চিত করবে, কিন্তু আজকের যুব প্রজন্মকে আদর্শগত এবং সঠিক দিশা নির্দেশের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

বর্তমান সার্বিক পরিস্থিতি দেখে সমাজের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের দায়িত্ব রয়েছে যে তাঁরা যুবপ্রজন্মকে উপযুক্ত দিশা নির্দেশের মাধ্যমে আদর্শ ব্যক্তিত্ব নির্মাণ করা। যদি যুবপ্রজন্মই যথাযথ প্রবুদ্ধ হতে না পারে তবে ভবিষ্যৎ ভয়াবহ। দেশে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী শক্তি বিদেশি অর্থে যুব প্রজন্মকে দিগ্‌ভ্রান্ত করে চলেছে। সাম্যবাদী বিচারধারার নামে যুবদের 'মগজ ধোলাই' করে মাওবাদের দিকে ঠেলে দেওয়ার বহু উদাহরণ আমরা দেখতে পাই। রাষ্ট্র বিরোধী শক্তি বিভিন্ন প্রসঙ্গকে সামনে এনে যুব সমাজের ক্রোধ ও ক্ষোভকে নিজেদের লাভের জন্য অপব্যবহার করছে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেশের বিরুদ্ধে করে দিচ্ছে। যুব প্রজন্মের ক্ষমতাকে ব্যবহার করে দেশের বিকাশে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা আবশ্যক। যদি বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে পৌঁছতে হয় তবে তাদের ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার হওয়া প্রয়োজন। স্বামীজীর স্বপ্নের যুবভারত নির্মাণের জন্য স্বামীজীর কথাই স্মরণ করা যাক — 'একটি পথ নিশ্চিত কর, তার সম্বন্ধেই চিন্তা কর, সেই ভাবনাকে নিজের জীবন কর, তারই স্বপ্ন দেখ, এটাই সফলতার পথ।'

যারা টুকরোকে জুড়ে ফেলার শক্তি রাখে, যারা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রাখে, যাদের মধ্যে সব রকমের কুপ্রথা, বদ্‌গুণ ও অবাঞ্ছিত প্রথাকে নির্মূল করে তার জায়গায় ভালো রীতি, সদ্‌গুণ ও কাঙ্ক্ষিত পরম্পরাকে গ্রহণ করার শক্তি রয়েছে, তারাই প্রকৃত যুব। আধুনিক মানব ইতিহাসের প্রতিটি পদক্ষেপে তাদের অংশগ্রহণ মহামূল্যবান। যদি আমরা সারা বিশ্বের ব্যক্তিদের জীবন কাহিনি দেখি, যারা নিজেদের আনন্দময় শৈলীতে সফলতা এবং অত্যধিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তাদের সফলতার চাবিকাঠি তাদের যুবাবস্থার প্রাণশক্তির মধ্যে নিহিত। যুবপ্রজন্মের ব্যক্তিত্বের মধ্যে জ্ঞান, শক্তি, কৌশল, করুণা ও সাহস এই পাঁচগুণের সমাবেশ রয়েছে।

আজ সারা বিশ্বে যুব প্রজন্মের জয়জয়কার। সরকারি সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে শুরু করে তারা বড়ো বড়ো কর্পোরেট আন্তর্জাতিক কোম্পানিতে প্রথম সারিতে থেকে দায়িত্ব বহন করে চলেছে। একসময় যুবপ্রজন্মই গুগল ও ফেসবুকের মতো কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছে এবং তা বিশ্বের অগ্রণী কোম্পানি রূপে আজ প্রতিষ্ঠিত। তারা আজকের যুব প্রজন্মের কাছে প্রেরণাস্বরূপ। যুবসমাজের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের গভীর আকর্ষণ ছিল। তিনি গভীরভাবে অনুভব করতেন যে যুবসমাজই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সৃজনীশক্তি। কোনো দেশের প্রগতি তখনই সর্বোত্তম হয় যখন সেই দেশের যুবসমাজ চরিত্রবান হয়। এর জন্য স্বামীজী যুবাদের পরিভাষা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, 'যে নিজের কর্তব্য না ভুলে অনবরত সৃজনশীল কাজে যুক্ত থাকে এবং দেশের উন্নতিতে নিজের ইতিবাচক শক্তি প্রয়োগ করে, তাকে যুব বলে।'

আজও সারা বিশ্বের যুব প্রজন্ম শিক্ষা, রোজগার এবং সামাজিক, পারিবারিক জীবন সম্বন্ধিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংঘর্ষ করে যাচ্ছে। তাদের জন্য সুযোগ নির্মাণ এবং জীবনের সমস্ত পদক্ষেপে সরলতা নিয়ে আসা একটা বড়ো সমস্যার বিষয়। আগামী সময়ে ভারতের শ্রম শক্তিতে যুবাদের অংশগ্রহণ বাড়বে। এই যুবাদের সংখ্যার বলে দেশের অর্থব্যবস্থা নতুন উচ্চতায় পৌঁছতে পারে। যুব প্রজন্মের প্রাথমিকতা ও প্রয়োজনীয়তার মধ্যে বড়ো পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। বর্তমান যুবপ্রজন্ম সামাজিক কার্যকলাপ ও সামূহিক কাজে আকৃষ্ট হচ্ছে। তার জন্য ব্যক্তিগত মূল্যবোধের সঙ্গে মানবিক মূল্যবোধও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে। আজকের যুবসমাজ সফলতাকে নতুন আঙ্গিকে পরিভাষিত করছে। দেশের উন্নতি সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবেশকে উন্নত করাতে প্রভাব সৃষ্টি করে। আজকের যুব বন্ধ ঘরে বসে পরিবর্তনের কথা বলে না, বরং বাইরে এসে সেই পরিবর্তনকে প্রত্যক্ষ করতে আগ্রহী। বর্তমান সময়ে এই সব বিষয়ে তাদের আগ্রহ বেড়েছে। তারা সামাজিক কার্যকলাপে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে, কেননা তারা তার গুরুত্ব অনুভব করতে পেরেছে।

বিপুল যুবশক্তি আমাদের দেশের জন্য এক স্বর্ণময় অধ্যায়। প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্তিতে দেশকে বিকশিত রূপে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্য রেখেছেন। এই লক্ষ্য পূর্তিতে যুব প্রজন্মের অনেকে বড়ো ভূমিকা রয়েছে। জাতীয় কল্যাণকে অগ্রাধিকার দিয়ে তিনি বলেন, স্বাধীনতার অমৃতকাল বিকশিত ভারতের লক্ষ্য প্রাপ্তির জন্য অগ্রসর হওয়ার এটাই সঠিক সময়। বর্তমান যুবশক্তি পরিবর্তনের বাহক এবং লাভার্থীও। আগামী ২৫ বছর তাদের ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং যুব প্রজন্মের শক্তিতেই ভারত ভবিষ্যতে বড়ো লাফ দেবে। তাদের নিজের চিন্তাভাবনার স্তর অতিক্রম করতে হবে এবং গণ্ডি পেরিয়ে নতুন নতুন চিন্তাভাবনা করতে হবে। এই যুবই ভবিষ্যতে এক নতুন সমাজ নির্মাণ করবে। ভবিষ্যতে নতুন সশক্ত, সংগঠিত, জাগ্রত সমাজ এবং বিকশিত ভারত কেমন হবে তা নিশ্চিত করার কর্তব্য অধিকার তথা দায়িত্ব বর্তমান যুব প্রজন্মের কাছেই রয়েছে।

(লেখক হিন্দি বিবেক পত্রিকার মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক)

ইউনুস জমানায় ক্রমশ ঋণের ফাঁদে জড়াচ্ছে বাংলাদেশ : হাত পাতছে চীনের কাছে

ইদানীংকালে কূটনীতির জগতে ভারতের অসামান্য সাফল্য বাংলাদেশকেও ভারতের মুখাপেক্ষী করেছিল। নয়াদিল্লির বিশ্বস্ত বন্ধুতে পরিণত হয়েছিল ঢাকা। বিগত পঞ্চাশ বছর আগের মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কোভিড সংকট, যে কোনো বিপদেই বাংলাদেশের পাশে ছুটে দাঁড়াতে দেখা গিয়েছে ভারতকে। ফলে ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা-ব্যবস্থাও ক্রমশ আঁটোসাঁটো হচ্ছিল। সেই বাংলাদেশই আজ কার্যত কৃতজ্ঞতা ভুলে ভারতের শত্রু হওয়ার দিকে এক এক পা করে এগোচ্ছে। পায়ে পা লাগিয়ে ঝামেলা বাধানোর চেষ্টা করছে অবিরত। কলকাতা, ত্রিপুরা, সেভেন সিস্টার্স দখল করার ফাঁকা হুমকিও দিয়ে যাচ্ছে। ফলে ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা-ব্যবস্থা সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক এবং তাতে চিড় নিয়ে সম্প্রতি মুখ খুলেছেন সে দেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মহম্মদ ইউনুস।

কূটনীতিকরা মনে করছেন, শেখ হাসিনার শাসনকালে ভারত- বাংলাদেশ যতটা ঘনিষ্ঠ ছিল, ইউনুস জমানায় ততটাই তিক্ত হচ্ছে দিনে দিনে। এবার ইউনুস নিজেই এই সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুললেন। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে দাঁড়িয়ে ব্যক্তিগতভাবে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন তিনি। পাশাপাশি রয়টার্সকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক যথাসম্ভব মজবুত হওয়া উচিত। বাংলাদেশের মানচিত্র ছাড়া ভারতের মানচিত্র আঁকা সম্ভব নয়।' মুখে এই কথা বললেও ঋণের জন্য এখনো চীনের দ্বারস্থ হচ্ছেন ইউনুস। আর এতেই উদ্বেগের জট আরও বাড়ছে। এমনিতেই গলা পর্যন্ত দেনায় ডুবে রয়েছে বাংলাদেশ। দেনা ছিল আগে থেকেই, এখন তা বেড়েছে আরও। এমতাবস্থায় ঋণের জন্য আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার বা ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফান্ড অর্থাৎ আইএমএফের দ্বারস্থ হয়েছিল বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার।

ফেব্রুয়ারির ১০ তারিখ ওই ঋণের চতুর্থ কিস্তির টাকা আসার কথা। কিন্তু শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তা আটকে দিয়েছে আইএমএফ। এনিয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, প্রবল আর্থিক সংকটের মুখে পড়েই আইএমএফের থেকে ঋণ নিয়েছিল বাংলাদেশ। কিন্তু অর্থনীতিবিদদের আশংকা, মোল্লাবাদীরা ইচ্ছাকৃতভাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা আরও বেহাল করছে, যাতে ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়া ছাড়া আর কোনো পথ খোলা না থাকে। যাইহোক, ওই ঋণের শেষ কিস্তি তো আটকে গিয়েছেই, উপরন্তু আরও ৭০ কোটি ডলার ঋণ চেয়েছিল ইউনুস প্রশাসন। সেই টাকারও দেখা নেই। বাংলাদেশি সংবাদমাধ্যম এর কারণ হিসেবে টেকনিক্যাল সমস্যা দাবি করলেও জানা গিয়েছে, একথা সর্বৈব মিথ্যে। আইএমএফের শর্ত পূরণে ব্যর্থ হতেই নাকি আটকে গিয়েছে টাকা। একে তো, সহজে ঋণ মেলে না আইএমএফের থেকে। এর জন্যে, দেশের সরকারকে প্রচুর কর বাড়াতে হয়, বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডারও বাড়াতে হয়।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের নতুন সরকার লাগাতার কর বাড়িয়েই চলেছে। সম্প্রতি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে অতিরিক্ত ভ্যাটের বোঝা। ইউনুস সরকারের দাবি, এই ভ্যাটের মাধ্যমে সরকারের ১২ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব আয় হবে। কিন্তু বাংলাদেশের এখনই নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর দশা। ভ্যাট বাড়তে পরিস্থিতি হাতের নাগালে বেরিয়ে যায়। সরকারের খরচ চালানোর অবস্থাও ছিল না। তারপরেও পূরণ হয়নি শর্ত। জানা যাচ্ছে, বাড়তি সময়ের জন্য নাকি আইএমএফের কাছে তদ্বিরও করেছিলেন ইউনুস। কিন্তু চিড়ে ভেজেনি। মার্চে ইউনুস প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকের পর নতুন পরিকল্পনা হাতে পেলে তারপরেই ঋণের কিস্তির টাকা ছাড়া নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে আইএমএফ। অর্থনীতিবিদদের দাবি, ইউনুস প্রশাসন ইচ্ছাকৃতভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে খাদের কিনারার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যাতে চীনের দ্বারস্থ হওয়ার ব্যাপারে একটা যুৎসই অজুহাত পাওয়া যায়।

জানা গিয়েছে, সুদের হার হ্রাস, ঋণের মেয়াদ বৃদ্ধি এবং নতুন কিছু ঋণ মঞ্জুর করতে রাজি হয়েছে চীন। চলতি ফেব্রুয়ারিতেই নতুন চুক্তি হতে পারে। তবে চীনের কাছে হাত পেতে যে ইউনুস বড়ো ভুল করেছেন, তেমনটাই কিন্তু মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল। বাংলাদেশের এই চরম আর্থিক সংকটের সুযোগে চীন যে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না, বরং ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশি সন্ত্রাসকে আরও উসকাবে তেমনটাই মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে এখন তাদের নতুন বন্ধু হয়েছে চীন। মহম্মদ ইউনুস চীনকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন বাংলাদেশের 'কঠিন সময়ে' পাশে দাঁড়ানোর জন্য।

অন্যদিকে, শেখ হাসিনাকেও ফের একবার দুষছেন মহম্মদ ইউনুস। তিনি বলেছেন, 'হাসিনা জমানায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি নিয়ে যে দাবিগুলি করা হয়েছিল, তা মিথ্যা। আমাদের দেশের বর্তমান আর্থিক অবস্থা গোটা বিশ্বের কাছে একটা শিক্ষা। তিনি (হাসিনা) বলেছিলেন আমাদের বৃদ্ধির হার সব থেকে বেশি, কিন্তু সেটা সবটাই মিথ্যা ছিল।' কিন্তু প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে, হাসিনা জমানার মিথ্যা ঢাকতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শান্তি পরিস্থিতিকে কী বিঘ্নিত করছে না বাংলাদেশ? □

সংবিধানে ভারতের জাতিভিত্তিক সংরক্ষণ একটি পর্যালোচনা

আম্বেদকর প্রথম নন, ভারতে জাতিভিত্তিক সংরক্ষণের কথা প্রথম পাওয়া যায় উইলিয়াম হান্টার এবং জ্যোতিরাও ফুলের লেখায়। স্বাধীন ভারতের এই সংরক্ষণ কেবল চাকরি বা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নয়। পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি, বিধানসভা কিংবা লোকসভার ক্ষেত্রেও সংরক্ষণ রয়েছে।

ড. চন্দ্রশেখর মণ্ডল

সাম্প্রতিক প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে ‘কোটা বিরোধী’ এক আন্দোলন কীভাবে নির্বাচিত সরকার বিরোধী জঙ্গি আন্দোলনে রূপান্তরিত হলো তা সারা বিশ্ব লক্ষ্য করেছে। শেষ পর্যন্ত শেখ হাসিনা সরকারকে উৎখাত করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্বভার গ্রহণ করে তাদের দেশের সংবিধানকে ছিন্নভিন্ন করার বড়ো প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অপরদিকে ভারতের সংবিধানে উল্লেখিত জাতিভিত্তিক সংরক্ষণ বা কোটার সমালোচনায় উচ্চবর্ণের মানুষরা সোচ্চার হয়েছেন। বর্ণে উচ্চ কিন্তু আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষ যাঁরা এই সংরক্ষণে সবচেয়ে বড়ো ভুক্তভোগী মূল ক্ষোভ তাঁদেরই।

তবে বাংলাদেশ ও ভারতের কোটার মূলনীতি এক নয়। বাংলাদেশের সংরক্ষণ মূলত মুক্তিযোদ্ধা, নারী এবং শারীরিকভাবে অক্ষম নাগরিকদের জন্য। সংরক্ষণের একটি বড়ো অংশ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করা মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মের সন্তানসন্ততি ও নাতি-নাতনিদের জন্য এবং তা মোট সংরক্ষণের ৩০ শতাংশ। বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটির মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা মোটামুটি আড়াই লক্ষ অর্থাৎ জনসংখ্যার এক শতাংশের কিছু বেশি মানুষের জন্য সংরক্ষণ বরাদ্দ ৩০ শতাংশ। কোটা বিরোধী আন্দোলনকারীদের মূল দাবি এই মুক্তিযোদ্ধাদের পরবর্তী প্রজন্মের সংরক্ষণ নিয়ে। অপরপক্ষে ভারতে সংরক্ষণ দেওয়া হয়, জাতিগতভাবে যারা যুগ যুগ ধরে পিছিয়ে রয়েছে, সামাজিক লাঞ্ছনা সহ্য করেছে— দেশের সেইসব নাগরিকদের। তবে মনে রাখা জরুরি যে, ভারতের সংবিধানে সংরক্ষণের একমাত্র লক্ষ্য অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করা নয়, ভারতের সংবিধানে সংরক্ষণের মূল লক্ষ্য জাতপাতের ঊর্ধ্বে সম অবস্থা ও সমন্বয় তৈরির লক্ষ্যকে ত্বরান্বিত করা। প্রাচীন ভারতেও সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রচলন ছিল, তবে সেই সংরক্ষণ ছিল শিক্ষা ও কর্মের উপর ভিত্তি করে। কোনোভাবেই আজকের মতো জন্মগতভাবে জাতিভিত্তিক সংরক্ষণ নয়।

প্রাচীন ভারতে বর্ণাশ্রম প্রথায় কর্মের ভিত্তিতে ভাগ হওয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কালক্রমে জন্মগতভাবে জাতিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। তীব্র হলো জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা ও বর্ণের ভিত্তিতে সমাজের বিভাজন। শূদ্রদের শাস্ত্র পাঠের অধিকার কেড়ে নেওয়া হলো, থাকলো না সম্পত্তির উপর তাদের অধিকার। পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার ছিল না প্রায় এক হাজার বছর। উচ্চবর্ণের সঙ্গে একই আসনে আহার, একই জায়গার জল ব্যবহার, একই শ্মশানে দাহ, একই পূজা-অর্চনায় অংশগ্রহণ আজও সব জায়গায় সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সীমিত ক্ষেত্র ছাড়া আত্মীয়তা তৈরি কিংবা বিবাহ বন্ধনের জাতিগত বিভেদের এই প্রাচীর আজ ভয়ংকর শক্ত বলে মনে হলেও, ২০০০ বছর আগে এই ব্যবস্থা চালু ছিল না ভারতে।

ভারতের এই সংরক্ষণের ইতিহাস :

- ভারতের ইতিহাসে প্রথম সংরক্ষণ দেওয়ার নজির কোলাপুরের রাজা সাহুজীর। ১৯০২ সালে নিজের রাজ্যে পিছিয়েপড়া মানুষদের চাকরির জন্য প্রথম সংরক্ষণ চালু করেছিলেন।
- মহীশূর রাজ্যে ১৯২১ সালে সমাজের পিছিয়ে থাকা প্রজাদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছিল।
- ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে পিছিয়ে থাকা মানুষের জন্য একটি মাইলফলক ‘পুনা চুক্তি’ (১৯২৯)। পরাধীন ভারতে তাদের জন্য সেই রাজনৈতিক সংরক্ষণের বিরোধিতা করে গান্ধীজীর অনশনের পরও কার্যকর হয়ে যায় আইনটি। রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ এই চুক্তির বিরোধিতা করেছিলেন হিন্দু সমাজের বিভাজনের আশঙ্কায়। ১৯৩০ সালে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে ভাইসরয় ঘোষণা করেন এই চুক্তির মাধ্যমে ওই শ্রেণীর জন্য ৮.৫ শতাংশ সংরক্ষণ কার্যকর করা হবে। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই,

ফঃ ২

পরাধীন ভারতের রাজনৈতিক আবহে গান্ধীজীই প্রথম ব্যক্তি যিনি অস্পৃশ্যতা, জাতিগত বিভেদ প্রভৃতিকে প্রথম আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসেন এবং মনে করতেন 'অস্পৃশ্যতা বিলুপ্ত হলেই হিন্দু ধর্ম বাঁচবে, আর যদি অস্পৃশ্যতা দূর না হয়, তাহলে হিন্দু ধর্ম অবলুপ্ত হবে।'

● ১৯৫০ সালে ড. বিআর আম্বেদকরের নেতৃত্বে সংবিধানে তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণ দেওয়া হয়। তপশিলি উপজাতিদের জল, জমি, জঙ্গলের বিশেষ অধিকার নিশ্চিত করা হয় সংবিধানে।

● ১৯৯০ সালে জাতিভিত্তিক সংরক্ষণ আইনি স্বীকৃতি লাভ করে, তৈরি হয় নতুন আইন।

● ১৯৯২ সালে ভিপি সিংহ নেতৃত্বাধীন সরকার ওবিসিদের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করে, পরে অবশ্য এই ব্যাবস্থায় কিছুটা সংশোধন করা হয়। এর আগেই সুপ্রিম কোর্ট ঘোষণা করেছিল দেশের মোট সংরক্ষণ কোনোভাবেই ৫০ শতাংশের বেশি হবে না। তবে রাজ্য চাইলে ৫০ শতাংশের বেশি সংরক্ষণ দিতে পারে কিন্তু তার একটি যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সেই অনুসারে তামিলনাড়ুতে ৬৯ শতাংশ, তেলেঙ্গানায় ৬২ শতাংশ এবং ৫২ শতাংশ কোটার ব্যবস্থা রয়েছে। মুসলমানদের অনগ্রসর শ্রেণীকে ওবিসি অন্তর্ভুক্ত করার কাজ পশ্চিমবঙ্গের মতো কয়েকটি রাজ্য করেছে সংরক্ষণের মূল সাংবিধানিক কাঠামোর বাইরে গিয়ে মুসলমান তোষণের নির্লজ্জ রাজনীতির উদ্দেশ্যে। সেই অনুসারে প্রাক্তন বিচারপতি বিপি মণ্ডলের নেতৃত্বে গঠিত 'মণ্ডল কমিশন' ১৯৮০ সালে অর্থনৈতিক ও শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়গুলিকে চিহ্নিত করে। বৈষম্যহীন এক সমাজ গড়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে তাদের সুপারিশ অনুসারে ওবিসিদের জন্য ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ ঘোষণা হয়।

২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে ভারতে মোট জনসংখ্যা ১২১ কোটি। জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায়ের শ্রেণী বিভাগে দেশে তপশিলি উপজাতির সংখ্যা ৮.৬১ শতাংশ, তাদের জন্য সংরক্ষণ ৭.৫ শতাংশ। দেশে তপশিলি জাতি মোট জনসংখ্যার ১৬.৬৩ শতাংশ, তাদের জন্য সংরক্ষণ ১৫ শতাংশ। ভারতে ওবিসি শ্রেণীভুক্ত মানুষ বসবাস করেন ৫২ শতাংশ, তাদের জন্য সংরক্ষণ ঘোষণা হয় ২৭ শতাংশ। বাকি ২৫ শতাংশ হলো সাধারণ বা উচ্চবর্ণের, মোট হিসেবে তাদের জন্য রইল ৫০ শতাংশ। যদিও সংবিধান সভার সভাপতি ড. বিআর আম্বেদকরের মন্তব্য অনুসারে ভারতের সংবিধানে এই সংরক্ষণ ১০ বছরের জন্য কার্যকর। দীর্ঘদিন এই ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়ার কথা তিনি কোনোভাবেই বলেননি। প্রতিটি শাসক এই মেয়াদকে আজ পর্যন্ত বাড়িয়ে এসেছেন, প্রতি দশ বছর অন্তর। মনে রাখা জরুরি যে, গণপরিষদে দাঁড়িয়ে ড. আম্বেদকরের সেই ঐতিহাসিক বক্তব্য— দেশের মানুষের মধ্যে অসাম্য, জাতিগত ভেদ, অস্পৃশ্যতা দূরীভূত না হলে 'গণতন্ত্র হবে গোময়ে তৈরি এক অট্টালিকার সমতুল্য।'

তবে আম্বেদকর প্রথম নন, ভারতে জাতিভিত্তিক সংরক্ষণের কথা প্রথম পাওয়া যায় উইলিয়াম হান্টার এবং জ্যোতিরাও ফুলের লেখায়। স্বাধীন ভারতের এই সংরক্ষণ কেবল চাকরি বা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নয়। পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি, বিধানসভা কিংবা লোকসভার ক্ষেত্রেও সংরক্ষণ রয়েছে। সংরক্ষণের আওতায় অনেকে পেয়েছেন দেশ ও প্রদেশের মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উচ্চ পদে নিম্নবর্গের প্রতিনিধিত্ব তুলে আনার সংস্থান দিয়েছে ভারতের সংবিধান। মহিলাদের জন্য লোকসভায় ৩৩ শতাংশ এবং পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশের সংরক্ষণ ভারতের সংরক্ষণ ব্যবস্থার আরেকটি উজ্জ্বল দিক।

ভারতের সংরক্ষণ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে উচ্চবর্ণের বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধছে। সেই অসন্তোষ নতুন করে বিক্ষোভে রূপান্তরিত হলো ১৯৯২ সালে ভিপি সিংহ সরকারের অন্যান্য অনগ্রসর (ওবিসি) শ্রেণীর জন্য ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ ঘোষণা হওয়ার পর। রাজীব গোস্বামী নামে এক শিক্ষার্থীর নেতৃত্বে দিল্লিতে সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। ওবিসি শ্রেণীর জন্য নতুন করে সংরক্ষণ আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করেন রাজীব গোস্বামী। উত্তর ভারত-সহ সারা দেশে এই আন্দোলন ক্রমশ ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। দীর্ঘদিন ধরে শাসক বর্গ রাজনীতির চাপে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর উন্নয়ন কেবল রাজনৈতিক ইস্যু হয়েছে। অধরা থেকে গেছে তাদের অগ্রগতি, সামাজিক অসাম্য দূর করে জাতপাতহীন, সমতাযুক্ত সমাজের স্বপ্ন। সাম্প্রতিককালে জনবিচ্ছিন্ন কংগ্রেস জাতিভিত্তিক জনগণনার দাবি করে বিচ্ছিন্নতাকে নতুন করে উসকে দেওয়ার মধ্য দিয়ে দেশে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে। বর্তমানে উচ্চবর্ণের আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ে ১০ শতাংশ সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে সংবিধানের ৪৬ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে।

দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়কালে সামাজিক পরিস্থিতির নিরিখে বিচার করলে কিছুটা অনুমান করা যাবে তৎকালীন সামাজিক বৈষম্য ও জাতপাতের বিভেদময় চিত্র। রানি রাসমণি দ্বারা কালী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও স্বীকৃতি আসেনি, মেলেনি পূজা-অর্চনা শুরুর অনুমতি। তিনি যে কৈবর্তের সন্তান, তাই তাঁর অধিকার ছিল না। শেষ পর্যন্ত মন্দির কুলগুরুদের দান করার পরই স্বীকৃতি আসে, শুরু হয় পূজা অর্চনার কাজ। সেটাই আজকের দক্ষিণেশ্বর ভবতারিণী কালীমন্দির। অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদের এই কুপ্রথা থেকে হিন্দু সমাজকে বেরোতেই হবে।

হিন্দু সমাজে একতার অভাব ভারতকে যেমন একদিকে রাজনৈতিক- অর্থনৈতিক- সামাজিকভাবে পিছিয়ে দিচ্ছে, তেমনি মোল্লা-মৌলভি ও খ্রিস্টান মিশনারির প্ররোচনায় হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার চক্রান্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে— যা আগামীদিনে ভারতকে কঠিন সংকটের মুখে দাঁড় করাবে। □

জাতিগত জনগণনার দাবি আসলে ভারত ভাঙার চক্রান্ত

হিন্দু সমাজ মনে করে বৌদ্ধ, শিখ, জৈনরা বৃহৎ হিন্দু সমাজেরই অংশ। উপাসনা পন্থা কিছু ভিন্ন হলেও তারা ধর্মে-কর্মে ও লক্ষ্যে হিন্দু জাতিই। তাই উপাসনা পন্থার ভেদে, জনজাতি, উপজাতি বা দলিত ভেদে কোনো হিন্দুকে বিভক্ত করা যাবে না

ডাঃ সুকুমার মণ্ডল

ভারতকে অস্থির করার জন্য, ভারতকে দুর্বল করার জন্য, এমনকী ভারতকে ভেঙে টুকরো করার জন্য যে গভীর চক্রান্ত দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমি দুনিয়া চালিয়ে যাচ্ছে তার সাম্প্রতিক অংশ হলো ভারতে জাতিগত জনগণনার দাবি। এইরূপ ভারত ভাঙার চক্রান্তের অন্য অভিব্যক্তিগুলির মধ্যে আছে :

১. খালিস্তানি আন্দোলন এবং এই আন্দোলনের নামে কানাডাতে ভারতের জাতীয় পতাকা পোড়ানো, সঙ্গে ভয়ানক ভারতবিরোধী স্লোগান।

২. মণিপুরে অর্থ ও অস্ত্র সরবরাহ করে ব্যাপক ধর্মান্তরণ এবং জনজাতি খ্রিস্টানদের ভারত বিরোধী কাজে লিপ্ত করা।

৩. লাদাখ সীমান্তে ভারতের মিলিটারি পরিকাঠামো নির্মাণের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করা।

৪. বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে' স্লোগান তোলা।

৫. জর্জ সোরোসের মতো মারাত্মক ভারত বিরোধী ধনকুবেরের অর্থকে কাজে লাগিয়ে ভারতে বর্তমান সরকারকে বিচলিত করা বা নির্বাচনে পরাজিত করার চেষ্টা। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিশেষভাবে এই অর্থ ব্যবহার করা হয়েছে।

৬. ভারতের বিভিন্ন মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া এবং স্তম্ভ লেখকদের অর্থের দ্বারা

প্রভাবিত করে ভারত বিরোধী কাজে লাগানো ইত্যাদি।

এই যেসব ঘটনা ঘটছে এগুলি আমেরিকার Deep State conspiracy-র অন্তর্গত। আমাদের দেশের এক বিশেষ পরিবারের তথাকথিত রাজপুত্র এই চক্রান্তের নিশ্চিত অংশীদার। এতদিনে জোশুয়া প্রকল্পের কথা অনেকে শুনেছেন। এই জোশুয়া প্রকল্প হলো আমেরিকাস্থিত ইভাঞ্জেলিক্যাল খ্রিস্টান সংস্থা। অনগ্রসর কাজ হলো বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে সমস্ত জনজাতি, উপজাতি ও দলিত গোষ্ঠীগুলিকে খুঁজে বের করা এবং এদের খ্রিস্টান মতে ধর্মান্তরিত করা। ভারতবর্ষ এদের প্রধান লক্ষ্যস্থান বলা যায়।

এখন জানার চেষ্টা করা যাক, জাতিগত জনগণনা বিষয়টি কী। অন্য অনেক দেশের মতো ভারতে প্রতি দশ বছর অন্তর জনগণনা হয়ে থাকে। জনগণনার সময় কেবল মানুষের সংখ্যা গোনা হয় না, তাদের পরিবার, শিক্ষা, রোজগার ইত্যাদি কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু কোনোভাবে তাদের জাতপাতের তথ্য নেওয়া হয় না। অন্য কোনো সভ্য দেশেও জাতপাতের কথা জানতে চাওয়া হয় না। ব্রিটিশ আমলে ভারতে প্রথম জনগণনা করা হয় ১৮৭২ সালে। গণনা পরিচালনা করেছিলেন মেয়ো সাহেব। তিনিও জাতপাতের তথ্য নেওয়ার কোনো প্রয়োজন মনে করেননি। এভাবেই চলতে থাকে প্রতি দশ বছরে ভারতের জনগণনার কাজ। এরপর ধীরে ধীরে স্বাধীনতা আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকলে

১৯০১ সালের গণনার সময় ইংরেজ অফিসার রিসলে জনগণনার সঙ্গে জাতপাতের তথ্য নেবার নির্দেশ দেন। এইভাবে চলতে থাকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত। কিন্তু ১৯৩১ সালে ড. আম্বেদকর ও জাতীয় কংগ্রেস এই জাতপাত ভিত্তিক গণনার ঘোর বিরোধিতা করেন। গান্ধীজী বলেন— এভাবে ব্রিটিশরা ভারতের জনগণনাকে জাতগত গণনার মাধ্যমে বিভক্ত করে ভারতে শাসন কায়েম রাখতে চায়। এমন তথ্যও পাওয়া যায় যাতে বলা হয়েছে যে, জাতগণনার বিরোধিতা করে গান্ধীজী অনশন আন্দোলনও করেছিলেন।

১৯৪১ সাল থেকে জাতগত গণনা আর হয়নি। এবার ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পরে ভারত সরকার জনগণনার সঙ্গে জাতগত তথ্য নেবার কোনও প্রয়োজন মনে করেনি। তবে নেহরু চেয়েছিলেন সিডিউল কাস্ট এবং সিডিউল ট্রাইবদের হিসাব নেওয়া হোক, তবে কোনো জাত হিসাবে উল্লেখ না করে। এই ব্যবস্থা ২০০১ সাল পর্যন্ত চলছিল। কিন্তু ২০১১ সালের জনগণনার সময় আবার দাবি উঠল জাতগত গণনা করার। এই দাবির মূল হোতারা ছিলেন বিভিন্ন প্রদেশের ওবিসি রাজনৈতিক নেতারা। এবারের গণনায় জাতগত তথ্য নেওয়া হলো এবং আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য নেবার চেষ্টা করা হলো। ২০১৩-২০১৪ সালে জনগণনার চূড়ান্ত রিপোর্ট দেখে সরকারের চক্ষু স্থির হয়ে গেল। কেননা এখানে এসেছে তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের মিলিত সংখ্যা ৪৬ কোটি। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিল এত বড়ো সংখ্যাকে ক্যাটেগোরাইজ করা অসম্ভব, তাই এবিষয়ে অগ্রসর হবার আমাদের কোনো উৎসাহ নেই। এই জাতগণনা ভারত সরকারের কোনো কাজে না লাগলেও একে ব্যাপক উৎসাহে কাজে লাগাতে থাকল খ্রিস্টান মিশনারিরা আমাদের জনজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীর হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করে দেশবিরোধী কাজে তাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য। জনগণনার তথ্য কেন্দ্রীয় সরকারি ওয়েবসাইট এবং সরকার প্রকাশিত রিপোর্টে উল্লেখিত থাকায় সেগুলি খ্রিস্টান মিশনারিদের হাতে পৌঁছে গিয়েছিল। জাতগণনা নিয়ে এবং খ্রিস্টান মিশনারিদের ধর্ম পরিবর্তনের কাজের বিরুদ্ধে হিন্দু সংগঠনগুলি বরাবর বিরোধিতা করেছে এবং এখনো করে চলেছে। এই জাতগণনার তথ্য হাতে পাওয়ার ফলে ধর্মান্তরণকারী মিশনারিরা জানতে পারে ভারতের কোনো জনপদের মধ্যে কত সংখ্যক জনজাতি উপজাতি বাস করছে এবং এদের মধ্যে কাদের সফট টার্গেট বানিয়ে ধর্ম পরিবর্তনের কাজ করা যায়।

লক্ষ্য করার বিষয় যে, তথাকথিত যুবরাজের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত জাতগণনা নিয়ে তিনি কোনো উৎসাহ দেখাননি। ২০২২ সালে বিহার সরকার একটি সমীক্ষার কাজ পরিচালনা করে, যার উদ্দেশ্য ছিল কোন কোন এসি বা এসটি-দের সামাজিক ও আর্থিক উন্নতি কতটা হয়েছে সে ব্যাপারে। এরপর থেকে রাহুল গান্ধী পাগলের মতো বারবার জাতগণনার কথা তুলতে থাকছেন কেন? এই কেনর উত্তর আমাদের সকলের জানা প্রয়োজন। জাতগত জনগণনা হলে এই তথ্য আগে উল্লেখ করা জসুয়া প্রকল্প এবং অন্য খ্রিস্টান ধর্মান্তরণ সংস্থাগুলির হাতে যাবে, যার দ্বারা তাদের কাজে সুবিধা হবে। এইরূপ ধর্মান্তরিত জনজাতি প্রভৃতিকে উসকানি দিয়ে ভারতবিরোধী কাজে শামিল করা যাবে। যেভাবে খালিস্তানপন্থীরা ভারতবিরোধী কাজ করে চলেছে সেভাবে এইসব জনজাতির লোকেরাও প্রত্যক্ষভাবে ভারতবিরোধিতা করবে এমনকী তারা ভারতের মধ্যে হোমল্যান্ডের দাবি তুলবে। উত্তর-পূর্ব ভারতের কথা আমাদের স্মরণে থাকা আবশ্যক।

জোশুয়া প্রকল্পের ওয়েবসাইট থেকে জানা যায় তারা কেবল হিন্দু জনজাতি উপজাতিদের খুঁজে বের করছে না, তারা মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈনদের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠী উপগোষ্ঠীগুলিকেও খুঁজে বের করছে যাতে এদের মধ্যেও প্রবেশ করে ধর্মান্তরণের কাজ চালানো যায়। এরা ভারতের ব্রাহ্মণদের মধ্যে ১০০টি গোষ্ঠী খুঁজে বের করেছে। তাদের মধ্যে কোথায় পার্থক্য, কী ধরনের পার্থক্য এসব তথাও জোশুয়াদের ওয়েবসাইটে ঢোকানো হয়েছে। জোশুয়া বলেছে, এসব তথ্য তারা সংগ্রহ করেছে সরকারি জনগণনার তথ্য থেকে এবং স্থানীয় সংস্থাগুলির সংগ্রহ করা তথ্য থেকে। এখানে বলার বিষয় হলো, সরকার যেসব তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলি তাদের নিজেদের ববহারের জন্য এবং পরিকল্পনা রচনার জন্য করা হয়, তাই এগুলি সাধারণের মধ্যে আসবার কথা নয়। অথচ এসব তথ্য জোশুয়ার মতো সংস্থাগুলির হাতে পৌঁছে যাচ্ছে কীভাবে? এর থেকে বোঝা যায় আমাদের সরকারি দপ্তর কতটা ছিদ্রযুক্ত।

একটু আশার কথা, ২০১৪-২০১৫ সালের পর থেকে সরকার বিষয়টিকে অনেকটা সংশোধন করতে পেরেছে। জসুয়া তাদের ওয়েবসাইটে আরও বলেছে যে, তাদের দেওয়া তথ্যগুলি ২০১০ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত (ভারতের ক্ষেত্রে) সংগ্রহ করা। অর্থাৎ ২০১৫ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত নতুন বা পরিবর্তিত তথ্য তাদের হাতে নেই। সম্ভবত এই কারণে কিছু ব্যক্তি ও কিছু সংস্থা তথা রাজনৈতিক দলের এত অতি আগ্রহ ভারতের জাতগত জনগণনা করানোর।

হিন্দুরা মনে করে বৌদ্ধ, শিখ, জৈনরা বৃহৎ হিন্দু সমাজেরই অংশ। উপাসনা পন্থা কিছু ভিন্ন হলেও তারা ধর্মে, কর্মে ও লক্ষ্যে হিন্দু জাতিই। তাই উপাসনা পন্থার ভেদে, জনজাতি, উপজাতি বা দলিত ভেদে কোনো হিন্দুকে বিভক্ত করা যাবে না এবং বিভক্ত হতে দেওয়া যাবে না। ভারতকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে হবে এই লক্ষ্যে মস্ত ভারতবাসী তাদের চিন্তা-বিচার ও কর্মকে সঠিক পথে পরিচালিত করুক এটাই কাম্য।

আমেরিকান ডিপ স্টেটের অংশ হিসেবে জোশুয়া, অন্যান্য খ্রিস্টান সংস্থা এবং আরও কিছু সংস্থা তথা ব্যক্তি ভারতকে এবিষয়ে সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, সঙ্গে হিন্দু জনসাধারণকে সতর্কভাবে চলতে হবে। সকলকে স্মরণ রাখতে হবে ভারত শক্তিশালী ও সংগঠিত থাকলে দেশবাসী অনুরূপ থাকতে পারবে। অন্যথায় সবার জন্য সমূহ অঘটন-বিঘটন অপেক্ষা করছে। □

মহাকুম্ভের আয়োজনে যোগীকে ‘সনাতনাদিত্য’ আখ্যা দিলেন জুনা আখড়ার পীঠাধীশ্বর

দুর্গাপদ ঘোষ

প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভ মেলা কর্তৃপক্ষ তথা উত্তরপ্রদেশ সরকার অনেক আগে থেকে অনুমান করলেও এবার মহাকুম্ভে যে এত মানুষের আগমন ঘটবে তা অনেকেই আন্দাজ করতে পারেননি। কী প্রয়াগরাজ রেলস্টেশন থেকে সিভিল লাইন্স এবং ক্যান্টনমেন্টের পথ ধরে ত্রিবেণী মার্গ হয়ে, কী উলটোদিকে ঝুসির দিক থেকে লাইন দিয়ে বানানো ভাসমান সেতু বা পন্টুন ব্রিজ দিয়ে গঙ্গা পার হয়ে অথবা এলাহাবাদ দুর্গের ওদিক থেকে পন্টুন ব্রিজে যমুনা নদী পেরিয়ে, সব পথ এসে মিলে গেছে সঙ্গম পরিসরে। দূরদূরান্ত থেকে সড়ক পথে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ যানবাহনে এমনকী বিমানে করে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষের আগমন ঘটছে যেন ক্রমাগত আছড়ে পড়া মহাসাগরের ঢেউয়ের মতো। পাল্লা দিয়ে মহাকুম্ভ মেলার ৪ হাজার হেক্টর এলাকা জুড়ে বিস্তীর্ণ পরিসরে নিত্যদিন আসা-যাওয়া করা এবং ৭ লক্ষ কল্পবাসী-সহ অগুনতি তাঁবু, শিবির ও আখড়াগুলোতে অবস্থান করা পুণ্যার্থীদের জন্য এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত পরিকাঠামো ও অন্যান্য ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা দু'একদিনে সম্ভব নয়। অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরতে গেলেও স্থানে কুলোবে না। কী ব্যবস্থা করেনি রাজ্যের যোগী সরকার! নাগা সন্ন্যাসীদের পীঠাধীশ্বর থেকে জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্যগণ, বিধি ব্যবস্থা দেখে সমস্ত ধর্মাচার্যই যোগীর প্রশংসায় কেবল পঞ্চমুখ নয়, শতমুখ। প্রয়াগে কুম্ভমেলার বিষয়ে সম্রাট হর্ষবর্ধনের ইতিহাস যারা জানেন তাদের মনে হবে রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের শাসনকালে যেন সম্রাট হর্ষবর্ধনের সেই স্বর্ণযুগ ফিরে এসেছে।

এবারের এই মহাকুম্ভের আয়োজনে বিধি ব্যবস্থায় যাতে কোনো রকমের ত্রুটি না থাকে সেজন্য যোগী সরকার তথা উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন এবং মেলা কর্তৃপক্ষ অনেকদিন আগে থেকে প্রস্তুতি শুরু করেছিল। ১৩ জানুয়ারি পৌষ পূর্ণিমার দিন থেকে শুরু হওয়া মহাকুম্ভ মেলার সেই প্রস্তুতি পর্ব যখন প্রায় শেষের দিকে তখন অর্থাৎ ৫০ দিন আগেই, ২০২৪ সালের ২৬ নভেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের শাখা সংগঠন ইউনেসকো (UNESCO) কুম্ভমেলাকে ‘বিশ্বের বৃহত্তম ও শান্তিপূর্ণ তীর্থক্ষেত্র’ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। সুচারুভাবে আয়োজনের ব্যবস্থাপনার জন্য যোগী সরকারের ব্যাপক প্রশংসা করে বলেছে কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক মূল্য বজায় রাখার দায়িত্ব নিয়ে সরকার তা যথাযথভাবে পালন করে যাচ্ছে — ‘The government has respectfully followed the culture and values of such customs after taking over’। আর সনাতন হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা

ও প্রচার প্রসারে মহাকুম্ভের আয়োজন ও বিধি ব্যবস্থা দেখে জুনা আখড়ার প্রধান আচার্য স্বামী অবধেশানন্দ গিরি এতটাই মুগ্ধ হয়েছেন যে, মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথকে 'সনাতনাদিত্য' বা সনাতন সূর্য বলে আখ্যায়িত করতেও বাকি রাখেননি। যোগী আদিত্যনাথের প্রতি যারপরনাই সন্তুষ্ট গোবর্ধন পীঠের জগদ্গুরু শঙ্করাচার্যের মতো অন্যান্য ধর্মাচার্যরাও। স্বামী অবধেশানন্দজী ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন আদিত্যের (সূর্য) প্রকাশ যেমন জগৎকে আলোকিত করে থাকে যোগী আদিত্যনাথ তেমনি মহাকুম্ভ মেলাকে আলোকিত ও বর্ণময় করার জন্য সনাতন ধর্মধ্বজকে আরও উঁচুতে তুলে ধরার জন্য যা কিছু দরকার ছিল তার সবকিছুই করেছেন।

মহাকুম্ভ মেলা শুরু হবার একমাসেরও বেশিদিন আগে থেকে শুরু হয়েছে কল্পবাসী এবং নাগা সন্তদের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান জুনা, সবচাইতে শিক্ষিত নিরঞ্জনী, সবচাইতে বিত্তবান পঞ্চায়তী মহানির্বাণী-সহ নির্মোহী, দিগম্বর, উদাসীন, বৈষ্ণব, আবাহন, অটল, আনন্দা, অগ্নি প্রভৃতি আখড়া এবং অন্যান্য পীঠাধীশ্বর, মহামণ্ডলেশ্বর এবং তাঁদের শিষ্য ও অনুগামীদের আগমন। হোমযজ্ঞের জন্য এসেছেন প্রায় ৪০০ জন পুরোহিত। যোগী সরকার তাঁদের জন্য ১০০টি তাঁবু এবং ৪০০ টি কাঠের চৌকির ব্যবস্থা করেছে। একই সঙ্গে আসতে শুরু করেন রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতী, ওঁ নমঃ শিবায় প্রমুখ ধর্মীয়- সাংস্কৃতিক-সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের স্বয়ংসেবক তথা স্বেচ্ছাসেবী ও অন্যান্য কর্মীরা। সুতরাং বিশ্ববরেণ্য এই মহাকুম্ভ মেলা যাতে সুচারুভাবে ও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় সেজন্য প্রায় সর্বশক্তি দিয়ে আত্মনিয়োগ করেন মেলা কর্তৃপক্ষ তথা যোগী সরকার। পরিকাঠামো, অন্যান্য নির্মাণ, ৭টি প্রধান ঘাট নির্মাণে ৪৬০ কোটি টাকা ব্যয় করা ছাড়াও অন্যান্য স্থানের সংস্কার সাধন, নিরাপত্তা, স্বচ্ছতা, সাধারণ ও পানীয় জল, পরিবহণ, তাঁবু, আলো, বিভিন্ন আখড়া ও অন্যান্য সংস্থাগুলির জন্য জমি বণ্টন প্রভৃতি নানাবিধ বিধি ব্যবস্থার জন্য প্রথমেই যে প্রশাসনিক কাজটি করা হয়েছে তাহলো, কুম্ভ মেলা পরিসর তথা সঙ্গম সংলগ্ন এলাকাকে ২০২৪ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে ২০২৫ সালের ৩১ মার্চ এই ৪ মাসের জন্য একটি পৃথক জেলা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া। এই সূত্রে এই ৪ মাস ৪ হাজার হেক্টর এলাকাসহ সংলগ্ন এলাকা 'মহাকুম্ভ মেলা জেলা' নামে একটি পৃথক তথা বিশেষ জেলা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। এই অতিরিক্ত জেলার সুবাদে সাময়িকভাবে হলেও উত্তরপ্রদেশে এটি হলোএখন ৭৬ তম জেলা। আর এই বিশেষ জেলা গঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই কুম্ভ নগরীকে ২৫টি সেক্টরে ভাগ করে ফেলা হয়েছে। এই জেলা তথা কুম্ভনগরী এখন বস্তুত তাঁবুনগরী তথা বর্ণাঢ্য শিবির নগরীতে রূপান্তরিত হয়েছে।

কেবল পুণ্যস্নানই নয়। মহাকুম্ভে আগত ধর্মপ্রাণ মানুষরা যাতে অনেক কিছু দর্শন করতে পারেন, লাভ করতে পারেন সেজন্য যোগী সরকারের তত্ত্বাবধানে মেলা কর্তৃপক্ষ আরও অনেক কিছু নির্মাণ করিয়েছেন। ব্যবস্থা করেছেন অনেক কিছুর। সঙ্গম সংলগ্ন এলাকায় সবচাইতে আকর্ষণীয় ও প্রাচীন বড়ে হনুমান বা লেটে (শায়িত) হনুমান মন্দিরের সংস্কার করে পরিসর বৃদ্ধি করা হয়েছে। নতুন এক বিস্তৃত করিডর তৈরি করা হয়েছে অক্ষয় বট এবং পাতালপুরী মন্দির দর্শন করার জন্য। রামায়ণের বর্ণনা অনুযায়ী যেখানে মহামুনি ভরদ্বাজের আশ্রম ছিল মনে করা হয়ে থাকে সেখানে নির্মাণ করা হয়েছে ভরদ্বাজ আশ্রম। এছাড়া উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান হলো শিবালয় পার্ক। এখানে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দিরগুলির আদলে লোহার পাত দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ১২টি মন্দির। যাঁরা ভারতের বিভিন্ন স্থানে নির্মিত ১২টি প্রধান শিবমন্দির দর্শন করতে পারেননি, এখানে একই পরিসরে তাদের ছোটো আকারের প্রতিরূপ দর্শন করতে পারছেন। এছাড়াও মোরি মার্গে পৃথকভাবে তৈরি করা হয়েছে কাশীধামের সুপ্রাচীন তথা আদি বিশ্বেশ্বর মন্দিরের ১০৮ ফুট উঁচু একটি প্রতিরূপ। রামায়ণে বর্ণিত নিষাদরাজ গুহক যিনি বনবাসকালে রামচন্দ্র, সীতামাতা ও লক্ষ্মণকে তাঁর নৌকায় নদী পার করে দিয়েছিলেন তার স্মরণে যমুনা নদীতে 'নিষাদরাজ গুহক' নামে চালু করা হয়েছে ২০ মিটার লম্বা একটি ক্রুজ। তাতে একসঙ্গে ৬০ জন যাত্রী জলবিহার করতে পারেন। সঙ্গমস্থলকে কেন্দ্র করে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়কে মাথায় রেখে কুম্ভমেলার সময়কালে প্রায় দেড় লক্ষ বৃক্ষচারা রোপণ করা হচ্ছে। এই সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে রয়েছে তুলসী, নিম, অগস্ত্য, ধ্রুব, বেল, শমী ও অর্জুন এই 'সপ্তর্ষি বটিকা।' উল্লেখ্য, ২৬ মার্চ মহাশিবরাত্রির দিন সর্বশেষ শাহী স্নানের পর মহাকুম্ভ মেলার সমাপনান্তে সমস্ত জগদ্গুরুদের হাতে তুলে দেওয়া হবে চন্দন ও রুদ্রাক্ষ বৃক্ষের চারা।

মহাকুম্ভে আখড়ায় আখড়ায়, শিবিরে শিবিরে ধর্মাচার্যদের কাছ থেকে প্রবচনাদি শোনা ছাড়াও সবাই যাতে আরও নানা ধরনের ধর্ম বিষয়ক মনোরঞ্জন উপভোগ করতে পারেন সেজন্য মেলা কর্তৃপক্ষ বহু সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে ভজন-কীর্তন, ভক্তিগীতি, নৃত্য-গীত-বাদ্য, কবি সম্মেলন, লোকগীতি, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছেন। সঙ্গমস্থলে নিত্যদিন আসা-যাওয়া করা পুণ্যার্থী ছাড়াও অন্ত ১ লক্ষ ৬০ হাজার পুণ্যার্থী যাতে মেলা প্রান্তরে অবস্থান করতে পারেন সেজন্য কেবল মেলা কৃর্তৃপক্ষের তরফেই ৪০ হাজারের বেশি গৃহ নির্মাণ করানো হয়েছে। তার মধ্যে অসমের একটি সংস্থা সেখান থেকে মুলিবাঁশ এনে অনেকগুলো বাঁশের ঘর বানিয়েছে। এছাড়া অগুনতি সংস্থার শিবিরে থাকার ব্যবস্থা তো আছেই। ভারতীয় রেল মন্ত্রক ৩ হাজার বিশেষ ট্রেন-সহ মোট ১৩ হাজার ট্রেন চালানোর ব্যবস্থা করেছে প্রয়াগরাজ স্টেশন হয়ে। সব মিলিয়ে ৫ লক্ষ যানবাহন পার্কিঙের ব্যবস্থা করেছে যোগী প্রশাসন। ২৩টি শহর থেকে যাতে বিমান আসা-যাওয়া করতে পারে তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রয়াগরাজ বিমানবন্দরে।

মহাকুম্ভে নানা রকমের প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছাড়াও হিন্দু বিরোধী অনেক রাজনৈতিক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদী শক্তির হুমকি মোকাবিলায় যোগী সরকার স্থল, জল, আকাশ সমস্ত দিকেই যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা করেছে। সাধারণ পুলিশ, সশস্ত্র পুলিশ (পিএসি) ছাড়াও মোতায়েন করেছে আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের। দিনরাত নজরদারি চালানো হচ্ছে ড্রোন থেকেও। ব্যবস্থা করা হয়েছে নাইট ভিসন ক্যামেরা যুক্ত ড্রোনও। সমস্ত আখড়া ও আশ্রমের প্রথম সারির

সন্তদের নিরাপত্তায় মোতায়েন করা হয়েছে নিরাপত্তা রক্ষী। প্রায় ৩৮ হাজার পুলিশ ছাড়াও রয়েছে ১৩ হাজার হোমগার্ড। আর এই সমস্ত পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য 'আপদা মিত্র' নামে ১০ হাজার যুবককে প্রশিক্ষণ দিয়ে একটি বেসরকারি বাহিনী তৈরি করেছে যোগী প্রশাসন। এই বিশেষ বাহিনী অনেকটা বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-র মতো। তাঁরা প্রয়োজনে গোয়েন্দাদের মতো মেলার ভিতরে ঘোরাফেরা করে কোথাও কেউ কোনোরকম নাশকতার ছক কষছে কিনা সেদিকেও নজর রাখছেন। পুরো মেলা পরিসরের ওপর সারাক্ষণ নজরদারি চালানোর জন্য বসানো হয়েছে ২৩ হাজার সিসিটিভি ক্যামেরা। মহাকুম্ভ মেলা পরিসর এখন কেবল একটি বিশেষ জেলা কিংবা শুধু শিবির নগরী নয়, অধ্যাত্ম নগরীও। এই গরিমার দিকে নজর রেখে যোগী সরকার থানাগুলির নামকরণ করেছে বিশিষ্ট হিন্দু ব্যক্তিত্ব, হিন্দুস্থান, ভারতের প্রাচীন ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের নিরিখে। যেমন ভরদ্বাজ থানা, কল্পবাসী থানা, অক্ষয় বট থানা, মহামণ্ডলেশ্বর থানা, নাগ বাসুকি থানা, নারায়ণী আশ্রম থানা, সরস্বতী ঘাট থানা, আখড়া থানা, মহানান থানা, সঙ্গম থানা ইত্যাদি। এইভাবে মেলাক্ষেত্রকে মোট ১০টি বিভাগে ভাগ করে মোট ৫৬টি থানা এবং ১৫৫টি পুলিশ ফাঁড়ির এক্তিয়ারে রাখা হয়েছে। ২০০ জন করে পুলিশকে নিয়ে ২০টি 'সুপার টিম' বা বিশেষ পুলিশ দল তৈরি করে মন পরিসরের নিরাপত্তায় মোতায়েন করেছে। এসব থেকেই মেলা পরিসরে বিশালতা ও গুরুত্ব অনুধাবন করা যেতে পারে। কুম্ভমেলার ইতিহাসে এরকম বিধিব্যবস্থা আর কখনও হয়নি।

এছাড়া তৈরি হয়েছে 'ভুলে ভটকে' শিবির। অর্থাৎ হারানো প্রাপ্তি সম্পর্কিত ব্যবস্থা। সাময়িক চিকিৎসার জন্য তৈরি করা হয়েছে ১০০ বেডের হাসপাতাল। সেখানে অউটডোর ও ইনডোর ব্যবস্থার সঙ্গে আছে ১০টি আইসিইউ ইউনিট। মেলাক্ষেত্রের প্যারেড গ্রাউন্ডে এই অস্থায়ী হাসপাতালে জরুরি বিভাগ ছাড়াও বানানো হয়েছে প্রসূতি গৃহ, বসানো হয়েছে এক্স-রে, অল্ট্রাসাউন্ড, ইসিজি ইত্যাদি রেডিওলজির যন্ত্র। এমনকী অপারেশন থিয়েটারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর অনেক চিকিৎসকও এখানে সেবাদানে নিযুক্ত হয়েছেন। এর বাইরে ১০ একর জমি নিয়ে 'নেত্র কুম্ভ' নামে একটি চোখের হাসপাতালও তৈরি করা হয়েছে।

কুম্ভমেলায় আগত কেউ যাতে কোনোদিন অভুক্ত না থাকেন এজন্য মুখ্যমন্ত্রী যোগীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিঃশুল্ক ভোজনালয় তথা ভাণ্ডারা খুলেছে প্রায় ১ হাজার সেবামূলক সংস্থা। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো 'ওঁ নমঃ শিবায়'। এই সংস্থা মহাকুম্ভ পরিসরে ৫ জায়গায় বিশাল বিশাল রন্ধনশালা তৈরি করে 'অন্নসত্র' খুলেছে। রোজ যাতে ২ থেকে ৩ লক্ষ পুণ্যার্থীকে ভোজন করানো যায়, তার জন্য অনেক আধুনিক যন্ত্রপাতি কিনেছে এই সংস্থা। এমন একটি যন্ত্র বসানো হয়েছে যাতে প্রতি ঘণ্টায় ৬০ হাজার চাপাটি বানানো যায়। রোজ আটা-ময়দা মাখা হয় ৫০ কুইন্টালেরও বেশি। চোখে না দেখলে এসব সহজে কেউ বিশ্বাস করতে চাইবেন না। পাশাপাশি আনাজপাতি কাটা এবং আদা-লঙ্কা থেঁতো করার যন্ত্রপাতিও তেমনই। ভয়ংকর ঠাণ্ডার মধ্যেও রোজ ভোর ৩টে থেকে খাবার তৈরির কাজে লেগে পড়ছেন সংস্থার প্রায় ৫ হাজার স্বেচ্ছাসেবী। আর ভোজন মানে ডাবু হাতার খিচুড়ি ভোগ নয়। ময়রা ও পাচকের যতকিছু নিরামিষ সৃষ্টি— লুচি, পুরি, ভাজাভুজি, টক, ঝাল, মিষ্টি প্রায় সবই আছে। সঙ্গে কাশীর পেয়ারাও। কয়েক হাজার জন যাতে এক একবারে ভোজন করতে পারেন সেরকম ব্যবস্থা আছে। সকাল ৮টা থেকে শুরু করে বিকেল ৩টে পর্যন্ত এই ভোজনপর্ব চলছে। এছাড়া প্রতিদিন ২০ হাজার জনকে ভোজন করাচ্ছে আরও একটি সেবা প্রতিষ্ঠান— অক্ষয় পাত্র ফাউন্ডেশন।

সেবাকাজে এক কদমও পিছিয়ে নেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরাও। বিশ্বের এই বৃহত্তম সামাজিক-সাংস্কৃতিক তথা ভারতীয় রাষ্ট্রবোধে উদ্বুদ্ধ সংস্থা নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে মুখ্যত স্বচ্ছতার গুরুদায়িত্ব। এমনিতে মেলা কর্তৃপক্ষের পক্ষে ১ লক্ষ ৫০ হাজার শৌচাগার বানানো হয়েছে। সেইসঙ্গে প্রয়োজনীয় জলের ব্যবস্থাও। পাশাপাশি শুধুমাত্র পানীয় জলের জন্য বসানো হয়েছে ১ হাজার ৩০০ কিলোমিটার পাইপ লাইন। বসানো হয়েছে ৮৫টি নলকূপ। ২০১৯ সালের অর্ধকুম্ভের তুলনায় এবার আলোর ব্যবস্থাও চোখে পড়ার মতো। সেবার ৪০ হাজার ৭০০ এলইডি স্ট্রিট লাইট লাগানো হয়েছিল। এবার সেই সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ। তাছাড়া সাধারণ আলোর ব্যবস্থা তো আছেই। ১২ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত পুণ্যস্নানের জন্য যে সমস্ত ঘাট বানানো হয়েছে সেইসব ঘাট এবং কেবল পন্টুন ব্রিজগুলো রোজ পরিষ্কার করার জন্য ৩০০ কর্মী নিযুক্ত করা হয়েছে।

মহর্ষি বেদব্যাসের মহাভারত থেকে জানা যায় যে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় যে কাজটির দায়িত্ব নিতে সাধারণত কেউ পছন্দ করেন না সেই গুরুদায়িত্ব নিয়েছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। অর্থাৎ সবার পাদুকা সাজিয়ে রাখা। এঁটো পাতা কুড়োনো থেকে শুরু করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। মহাকুম্ভে যোগী সরকারের পক্ষ থেকে ১০ হাজার স্বচ্ছতা-সেবক নিযুক্ত করা হয়েছে। তাঁরা মূলত সবাই স্বেচ্ছাসেবী। উপরন্তু রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা স্বচ্ছতার মহাদায়িত্ব নিয়ে সেবাকাজ করে যাচ্ছেন। মহামেলা পরিসরে প্রতিদিন ৪ হাজার টনেরও বেশি আবর্জনা পরিষ্কার করতে হতে পারে এটা আন্দাজ করে স্বয়ংসেবকরা সবাইকে একখানা করে পাতার থালা এবং ভোজনান্তে উচ্ছিষ্ট সঠিক জায়গায় ফেলার জন্য একটি করে কাপড়ের থলে দিয়েছে। সেজন্য সারা দেশ থেকে মোট ১ কোটি ৫০ লক্ষেরও বেশি থালা ও ব্যাগ সংগ্রহ করার কাজ অনেক আগে থেকেই শুরু করে। এই থলে ও পাতার থালার নাম দেওয়া হয়েছে 'ডোনা-পত্তাল'। সঙ্ঘের সামাজিক সদ্ভাব বিভাগের প্রমুখ মোহনজী ট্যান্ডন একথা জানিয়ে বলেন যে, মহাকুম্ভে পরিবেশ দূষণ রোধে 'একটি থালা, একটি থলে'-র এই ব্যবস্থা নিয়েছে স্বয়ংসেবকরা। এছাড়াও সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সকলে যাতে সঠিক স্থানে উচ্ছিষ্ট ও আবর্জনা ফেলেন, সেজন্য সবাইকে পথনির্দেশ করে যাচ্ছেন। দূষণমুক্ত মহাকুম্ভ মেলার লক্ষ্যেই স্বয়ংসেবকরা স্বচ্ছতা তথা পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব নিয়েছে বলে জানিয়েছেন ট্যান্ডনজী। এত সমস্ত ছাড়াও আরও অনেক রকমের বিধি ব্যবস্থার জন্য সবাই মিলে যোগী

আদিত্যনাথের প্রশংসা করবেন তাতে আশ্চর্য কী! উল্লেখ্য, মহাকুম্ভমেলা পরিষেবার জন্য কেন্দ্র সরকার দিয়েছে ১ হাজার কোটি টাকা এবং উত্তরপ্রদেশ সরকার দিয়েছে ৬ হাজার কোটি টাকা। রাজ্য সরকারের অনুমান, কুম্ভমেলায় ২ লক্ষ কোটি টাকার ব্যবসা হবে, তার ফলে রাজস্ব বাবদ রাজ্য সরকারের হাতে আসবে ২৫ হাজার কোটি টাকা।

এর পাশাপাশি আরও দুটি ঐতিহ্যমণ্ডিত বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা যেতে পারে—

প্রয়াগের গঙ্গাজল

প্রয়াগরাজ : ত্রিবেণী তীর্থের গঙ্গাজল যে কত পবিত্র ও শুভ কাজের উপযোগিতা কারও অজানা নয়। গঙ্গাজলের মাহাত্ম্য যে কত গভীর তা উল্লেখের প্রয়োজন হয় না। কেবল ভারতবর্ষ কিংবা সমগ্র হিন্দু সমাজই নয়, গঙ্গাজল বিশ্বের অনেক দেশে এমনকী খ্রিস্টান সমাজেরও অনেকের কাছে পরম পবিত্র ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ শুভকাজে গঙ্গাজলকে পবিত্র জ্ঞানে ব্যবহার করে থাকেন। ইংল্যান্ডের সপ্তম এডওয়ার্ড, এক সময়ে বিশ্ব কাঁপানো মিউজিক ব্যান্ড 'বিটল্‌স'-দের মধ্যমণি জন হ্যারিসন, হলিউডের সুন্দরীশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী— নায়িকা জুলিয়া রবার্টস-এর মতো অনেকেই গঙ্গাজলকে পরম শ্রদ্ধা জ্ঞান করেছেন। মহারানি ভিক্টোরিয়ার জীবনাবসানের পরে ১৯০২ সালে সপ্তম এডওয়ার্ডের যখন রাজ্যাভিষেক হয় তখন জয়পুরের মহারাজা দ্বিতীয় সওয়াই মাধব সিংহ অনেকগুলো রুপোর কলসে ৮ হাজার লিটার গঙ্গাজল নিয়ে 'ওলেম্পিয়া' নামে তাঁর নিজস্ব জাহাজে করে ইংল্যান্ডে পৌঁছে যান। ব্রিটেনের রাজপরিবারের অনুরোধেই নাকি এটা করা হয়েছিল। আর সেই গঙ্গাজল নেওয়া হয়েছিল প্রয়াগরাজের গঙ্গা থেকে। এছাড়া ১৮৪৩ সালে ভারতে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন লিওপোল্ড ভ্যান অ্যার্লিক্স যখন ইলাহাবাদে (এখন প্রয়াগরাজ) নিযুক্ত ছিলেন তখন তিনি প্রায়ই সঙ্গমে এসে গঙ্গাস্নান করতেন বলে জানিয়েছেন ঐতিহাসিক অধ্যাপক যোগেশ্বর তিওয়ারি।

আরও জানা গেছে যে উল্লেখিত 'বিটলস' হ্যারিসন তাঁর মৃত্যুর আগে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তাঁর দেহ যেন চিতাগ্নিতে দাহ করা হয় এবং তাঁর অস্থি যেন ভারতে নিয়ে গিয়ে প্রয়াগরাজের গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয়। সেটা করা হয়েছিল। জুলিয়া রবার্টস এখনো জীবিত রয়েছেন। তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, জীবনাবসানের পর তাঁরও অস্থি যেন প্রয়াগে কিংবা হরিদ্বারে গঙ্গায় বিসর্জিত হয়।

অক্ষয়বট চির অক্ষয়

প্রয়াগরাজ : প্রয়াগরাজ তীর্থক্ষেত্রে পুণ্যস্নান ও পাথরে নির্মিত বিরাটাকার লেটে হনুমান বা বড়ে হনুমান মন্দির দর্শন ছাড়াও ভক্তদের কাছে একটা খুব বড়ো আকর্ষণের কেন্দ্র হলো 'অক্ষয়বট'। প্রাচীনকাল থেকেই এই বটবৃক্ষের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে আসছেন সবাই। এই পবিত্র বৃক্ষের গায়ে লাল সুতো জড়িয়ে এবং তার গোড়ায় প্রদীপ জ্বালিয়ে আরাধনা করে আসছেন তীর্থযাত্রী ও স্থানীয়রা। অক্ষয়বটের কাছে কোনো প্রার্থনা করলে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, এটা দীর্ঘকালের বিশ্বাস। বর্তমানে প্রয়াগরাজ দুর্গের মধ্যে অবস্থিত অক্ষয়বটের উল্লেখ এবং বিস্তারিত তথ্য মেলে একাধিক পুরাণ যেমন অগ্নি, বায়ু, পদ্ম, ব্রহ্ম পুরাণে। কিন্তু এর প্রতি হিন্দুদের আবেগ জড়িত ভক্তি বরদাস্ত করতে পারেননি ভারতে বহিরাক্রমণকারী মুঘল বাদশাহ জাহাঙ্গীর। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে হাকিম শাসমউল্লা কাদরির লেখা 'তেহরিক-ই-হিন্দ' থেকে জাহাঙ্গীরের হিন্দু বিরোধিতা তথা হিন্দু নির্যাতনের কথা স্পষ্টভাবেই জানা যায়। এতে অক্ষয়বট সম্পর্কেও অনেক তথ্য রয়েছে। কাদরি লিখেছেন যে, এই বৃক্ষের প্রতি হিন্দুদের ভক্তিশ্রদ্ধা দেখে সহ্য করতে না পেরে জাহাঙ্গীর তার ডালপালা কেটে মূলশুদ্ধ উপড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। আর কোনোদিন যাতে জীবিত না হতে পারে তার জন্য তার ওপর লোহার মোটা পাত দিয়ে চাপা দিয়েও ক্ষান্ত হননি। হিন্দুরা যাতে তার ধারেকাছে না আসতে পারে সেজন্য গোটা এলাকা লোহার পাতের বেড়া দিয়ে ঘিরে দিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক যোগেশ্বর তিওয়ারির গবেষণা অনুযায়ী অক্ষয়বটকে যাতে চিরতরে নির্মূল করে ফেলা যায় সেজন্য জাহাঙ্গীর তার শিকড়বাকড়ে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়েও দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনো কিছুই এই পবিত্র বটবৃক্ষের ক্ষতি করতে পারেনি। আজও অক্ষয় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। □

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

আত্মঘাতী বাংলাদেশ

বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালি জাতিকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে গড়ে উঠেছিল বাংলাভাষার দেশ তথা বাংলাদেশ। ইতিহাস সে কথাই বলে। তাই যদি হয়, তাহলে বাংলাদেশের বাংলাভাষী মানুষের একাংশ কী করে সংখ্যালঘু হয়ে যায়, তা বোঝা দুষ্কর। মুক্তিযোদ্ধারা যে খানসেনাদের বিরুদ্ধে লড়ে বাংলাদেশ নামক দেশটার সৃষ্টি করেছিলেন, সেই খান সেনাদের ধর্ম পরিচয় নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের মাথাব্যথা ছিল বলে শুনিনি। ভাষা-সৈনিকরাও বাঙ্গালি জাতি হিসেবে লড়েছিলেন পাকিস্তানি শাসকের অন্যায় ফতোয়ার বিরুদ্ধে। লড়াইটা ছিল বাংলা ভাষা বনাম উর্দু ভাষার। বাঙ্গালি সংস্কৃতি বনাম উর্দু সংস্কৃতির। সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান ছিলেন না। সবাই ছিলেন বাঙ্গালি। তাঁরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়াই করেছিলেন পাকিস্তানি শাসকের বিরুদ্ধে। এপার বঙ্গ ওপার বঙ্গ মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল বাংলা ভাষার জন্যে। অথচ সেই বাংলাদেশে আজ বাংলাভাষী হিন্দুদের বাংলাদেশ ছেড়ে 'মামার বাড়ি' চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

সম্ভবত বাংলাভাষার টান বাঙ্গালিকে আর এক রাখতে পারছে না। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ধর্ম পরিচয়টাই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাহলে এত ঢাকঢোল পিটিয়ে, কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন করার মাধ্যমে ওপার বঙ্গের সঙ্গে একাত্ম হতে চাইবার মধ্যে কি কোনো যুক্তি আছে? ভারতের সঙ্গে তো একুশে ফেব্রুয়ারির কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ এপার বঙ্গেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অসংখ্য একুশে ফেব্রুয়ারির শহিদ মঞ্চ। আমরা গেয়ে থাকি 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'। বিশেষ ওই দিনে দুই বঙ্গের সীমান্তে আমরা মিলিত হই। শুভেচ্ছা বিনিময় করি। আমরা বলি 'আমার ভাষা, তোমার ভাষা, বাংলা ভাষা, বাংলা ভাষা।' এতদিন যাঁরা ভাবতেন 'একুশে ফেব্রুয়ারি' দিনটি বাঙ্গালির আত্মপরিচয়ের দিন, তাঁরা হয়তো ভুল ভেবেছিলেন। হাসিনা-পরবর্তী ইউনুসের বাংলাদেশ যেভাবে মুক্তিযুদ্ধের সকল স্মৃতি মুছে দিতে চাইছে তাতে মনে হচ্ছে তারা ইউটার্ন নিয়ে একাত্তরের আগের অবস্থায় ফিরে যেতে চাইছে! কাগজে কলমে না হলেও অন্তত মানসিকভাবে। কুমিল্লায় বর্ষীয়ান মুক্তিযোদ্ধাকে যে ভাবে জুতোর মালা পরিয়ে সর্বসমক্ষে হেনস্থা করা হলো তারপর আর স্বাধীনতা দিবস পালনের কোনো অর্থ হয় না। তাই আশঙ্কা জাগে, ইতিহাস নতুন করে লিখতে গিয়ে 'একুশে ফেব্রুয়ারি'-র পাতাটাও না বদলে যায়!

যদিও একটা কথা বলার চেষ্টা হচ্ছে যে, বাংলাদেশে যা ঘটছে তা সবই হাসিনা শাসনে ক্ষমতার আতিশয্যের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। তাই যদি হয় তাহলে সকল সংখ্যালঘুদের জীবন বিপন্ন করেন তোলা হচ্ছে কেন? সব বাংলাদেশি হিন্দু তো হাসিনার দল করেন না। কথায় বলে 'খলের ছলের অভাব হয় না', কার্যসিদ্ধির জন্য তার বাহানা চান। সবটাই যেন সেই শাক দিয়ে মাছ ঢাকার অপচেষ্টা। যারা বাংলাদেশে গণহত্যা চালিয়েছিল, সেই পাকিস্তানিদের সঙ্গে মিত্রতা করে বীর সন্তানদের বলিদানকে ধুয়ে মুছে ফেলতে চাইছে ইউনুসের বাংলাদেশ। এখন শীর্ষস্তর থেকেই বলা হচ্ছে তথাকথিত এই 'গণঅভ্যুত্থান' 'চমৎকার ভাবে পূর্ব-পরিকল্পিত'। 'নির্বিচারে লুটতরাজ, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের চিহ্নিত করে নির্যাতন করা— সবই পরিকল্পনা মাফিকই হয়েছে বা হচ্ছে।' শুধু তাই নয়, অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত বেশ কয়েকজন কলাকুশলী অন্তর্বর্তী সরকারে ঢুকে বসে আছেন। যার জন্য কট্টরপন্থীরা এত সহজে বাংলাদেশের ইতিহাস 'রিসেট' করার কাজ চালিয়ে যেতে পারছেন। কট্টরপন্থীরা যে মনের মধ্যে একটা আস্ত পাকিস্তান লালন পালন করে বড়ো করে তুলেছেন, তারই প্রকাশ ঘটে চলেছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বদলে ফেলার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে। এই প্রচেষ্টা আত্মঘাতী হবে কিনা তা সময় বলবে।

—**অজয় ভট্টাচার্য**, বনগাঁ, উ: ২৪ পরগনা।

প্রকৃত রাজনেতা

একজন প্রকৃত রাজনীতিবিদ কাকে বলে দেখুন। তিনি ছিলেন এক প্রধানমন্ত্রী— আমাদেরই দেশের। সময়মতো বাড়িভাড়া না দিতে পারায় ৯৪ বছর বয়সের সেই বৃদ্ধকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিচ্ছেন বাড়িওয়ালা। বৃদ্ধের সম্বল কেবলমাত্র একটা মাদুর, পুরানো চাদর, অ্যালুমিনিয়ামের একটি বাসন, একটা পেয়ালা, প্লাস্টিকের একটি বালতি, মগ। বাড়িওয়ালর কাছে কাকুতি-মিনতি করে, আরও কয়েকদিন সময় চেয়ে চলেছেন বৃদ্ধ। প্রতিবেশীদের অনুরোধে কিছুটা নরম হলেন বাড়িওয়ালা। সময় দেওয়া হলো আরও পনেরো দিন। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় এক তরুণ সাংবাদিক লক্ষ্য করেন বিষয়টি। বিষয়টিকে খবর করতে হবে— এটা ভেবে বৃদ্ধের কয়েকটি ছবি, বাড়ির ছবি তুলে নিলেন সাংবাদিক। কী হেডলাইন করা যাবে এই খবরটায়, এ ব্যাপারে সাংবাদিক ঠিক করে নিলেন— 'টাকার জন্য এক অসহায় বৃদ্ধকে বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছেন, পাষাণহৃদয় এক বাড়িওলা।'

কাগজে সম্পাদক ওই সাংবাদিককে জিজ্ঞাসা করেন— 'চেনো এই বৃদ্ধটিকে?' 'না'— এই উত্তর শুনলেন। পরের দিন নিউজ পেপারে ছবি-সহ প্রকাশিত হলো— 'অসহায় অবস্থায় জীবনযাপন করে চলেছেন ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী।'

কিন্তু তিনি ছিলেন নিরুপায়। তাঁর আয়ের আর কোনো উৎস ছিল না। বন্ধুদের অনুরোধে কিছুটা বাধ্য হয়েই গ্রহণ করেছিলেন সরকারি ভাতা। কিন্তু সেটাও সময়মতো হাতে পেতেন না। দুই মাস ভাতা না আসার কারণে বাকি রয়ে গেছে বাড়িভাড়া। টাকার অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে ওষুধ পথ্য। খবর পৌঁছে গেল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিমা রাওয়ের কাছে। অনেক মন্ত্রী-সান্ত্রী, আমলা-সহ হাজির বড়ো একটা দল সেই ভাড়া বাড়িতে। বাড়িওয়ালা আশ্চর্যন্বিত! কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না। পরে তিনি জানতে পারলেন, ইনি স্বাধীনতা

ফঃ ৩

সংগ্রামী, দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী...! সঙ্গে সঙ্গে করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। বৃদ্ধ নিশ্চুপ। বললেন— 'ঠিকই আছে, আপনার কোনো দোষ নেই। যেটা করা উচিত, আপনি সেটাই করেছেন।'

এক স্বাধীনতা সংগ্রামী, এক ভারতরত্ন, সর্বোপরি স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। তাও আবার একবার নয়, দু-দুবারের প্রধানমন্ত্রী ভদ্রলোক। বৃদ্ধ বয়সে এই লোককেই কিনা ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিচ্ছিলেন! সরকার দিতে চেয়েছিল মাসিক ৫০০ টাকা ভাতা। কিন্তু তা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। বলেন— 'দেশের জন্য আত্মত্যাগ, টাকার বিনিময়ে বিক্রি করতে পারবো না।'

তাঁকে সরকারি আবাসন, বিভিন্ন সরকারি সুযোগসুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব জানানো হয়।

তিনি বলেন— 'আর কদিন তো রয়েছি, এভাবেই জীবনটা কেটে যাক না!'

১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে এই মহান মানুষটিকে ভারতরত্ন পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করে ভারত সরকার। মন্ত্রী এমপি, এমএলএদের না হয় বাদই দিলাম, আজকের দিনে যৎসামান্য শিক্ষায় শিক্ষিত একজন পৌরসভার চেয়ারম্যান অথবা পঞ্চায়েত প্রধানের কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি! আবার একজন সাধারণ পৌরপ্রতিনিধি কিংবা সাধারণ পঞ্চায়েত সদস্য— এর সম্পত্তিও কমপক্ষে কয়েক লক্ষ টাকা! —ভাবা যায়! রাজনীতির সংজ্ঞাটাই এখন বদলে গেছে— জনগণের সেবা নাকি পেশা!

এখন একজন নেতা, তিনি এই দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস, সামাজিক ইতিহাস, অর্থনৈতিক ইতিহাস কিছুই জানে না, অথচ এদের চারপাশে কত লোক! মিডিয়ার সামনে যে যত খারাপ কথা বলতে পারে, সে ততো বড়ো নেতা। আর মিডিয়া সেটাই ব্রেকিং নিউজ করে দেখায়, এতেই যে মিডিয়ার টিআরপি বৃদ্ধি পায়। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুলাই অবিভক্ত ভারতের পঞ্জাব প্রদেশে তাঁর জন্ম এবং ১৯৯৮ সালে ১৫ জানুয়ারি ৯৯ বছর বয়সে মৃত্যু হয়। মহান এই মানুষটির নাম গুলজারিলাল নন্দা, ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী।

—**দীপক খাঁ,** পাটপুর, বাঁকুড়া।

এক ভারতের জ্বালায় বাঁচি না, এর ওপর আবার ইজরায়েল!

লক্ষ্য করা যায় যে, ক্রিকেটে ভারত হারলেই বাংলাদেশের, পাকিস্তানের বা খোদ ভারতের একাংশ মুসলমান আনন্দে মেতে ওঠে। এ আনন্দ- উৎসব হিন্দু বিদ্বেষ থেকে উৎসারিত। ভারত-বিদ্বেষ যা মূলত হিন্দু বিদ্বেষ, এ উপমহাদেশে মজ্জাগত। আপাতত এ থেকে বেরিয়ে আসার কোনো লক্ষণ নেই। এজন্যে পাকিস্তান হিন্দুশূন্য, বাংলাদেশ হিন্দুশূন্য হবার পথে। ক্রিকেট খেলায় বাংলাদেশে ভারতের পরাজয়ে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। না, এটি কোনো গোপন বিষয় নয়, বাংলাদেশের একাংশ মুসলমান প্রকাশ্যেই বলেন, ভারত হারায় তাঁরা ইদের আনন্দ উপভোগ করেন।

'দি নিউজ-বাংলা' একদা হেডিং করেছিল— 'ভারতের হার, বাংলাদেশে উৎসব'। সব মুসলমান ওই দলে নয়। যশোরের একজন জাহাঙ্গীর আলম সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন— 'মানুষ এত 'বেইমান' হয় কী করে, শুধুই ধর্মের জন্যে— ছিঃ, বাংলাদেশ ছিঃ?' তাঁর পোস্টে একজন ভারতীয় শুভাশিস ভট্টাচার্য লিখেছেন— কেউ অস্ট্রেলিয়াকে সাপোর্ট করতেই পারে (২০২৩), কিন্তু কারণ জানতে চাইলে বলা হলো, ভারত মুসলমান দেশ নয়! অস্ট্রেলিয়াও তো মুসলমান দেশ নয়, তাহলে? ভারত হিন্দুদেশ। বিষয়টি ভারত নয়, বিষয়টি হিন্দু, এক্ষেত্রে ভারত-হিন্দু সমার্থক।

ভদ্রলোক লিখেছেন, বিষয়টি পরিষ্কার, অ্যান্টি-হিন্দু। ভারতের টিমে মহম্মদ সামি, সিরাজ আছে, তাঁরা চমৎকার খেলেন, তাহলেও হবে না, হিন্দুর সঙ্গে থাকলে চলবে না। তামান্না তাবাসুম মিথিলা সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, ইন্ডিয়া সব ম্যাচে জিতেছে, একটিতে হারতে নেই! তাঁর পোস্টে একজন শাহরিয়ার নাসিফ একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন— ভারত ১০টি জিতেছে, ১টি হেরেছে অর্থাৎ 'চোরের দশদিন গৃহস্থের একদিন'।

'আরকি' নামের একটি পোর্টাল ছবির আকারে একটি বক্তব্য দিয়েছে, তাতে লেখা— 'ইন্ডিয়া হেরে যাওয়ার খুশিতে চিৎকার করতে গিয়ে বড়ভাই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্যে ভারতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে'। মহম্মদ শাহরুখ ইসলাম এবং আরও অনেকে টিটকারি করে বলেছেন, 'হে প্রভু, হরি, কৃষ্ণ, জগন্নাথ, প্রেমানন্দ, 'এ কেয়া হুয়া'। হিন্দুরা বলেছেন, এরপরও তো তাঁরা কৃষ্ণনাম নিচ্ছে! ভারত-পাকিস্তান খেলায় অধিকাংশ বাংলাদেশি মুসলমান পাকিস্তানকে সমর্থন করে, এর হয়তো একটি কারণ থাকতে পারে, কিন্তু ভারত-অস্ট্রেলিয়া ফাইনালে (২০২৩) ভারতের পরাজয়ে উল্লাস বহুলাংশে 'বিজাতীয়'। হিন্দু বিদ্বেষ, ভারত বিদ্বেষ ব্যতীত আর কী কারণ থাকতে পারে?

কেউ যদি বলেন, ভারত হারায় এ উচ্ছ্বাস সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বই কিছু নয়, তাহলে তাঁরা আপনাকে সাম্প্রদায়িক বানিয়ে দেবে এবং 'চোরের মায়ের বড়ো গলা' হাঁকিয়ে বলবে, 'খেলার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা টেনে আনবেন না'! সন্ত্রাসের কথা উঠলেও তাঁরা বলেন, ধর্মের সঙ্গে সন্ত্রাসের কোনো সম্পর্ক নেই। তাহলেখেলার মাঠে নামাজ পড়েছিল কারা? বাংলাদেশ ও পাকিস্তান। এটি করে কার কী লাভ হয়েছে জানি না, তবে খেলায় জয় আসেনি। এর নিট ফলাফল সাম্প্রদায়িক শক্তিকে উসকে দেওয়া— যার পরিণতি ভারত বিদ্বেষ, যার উলঙ্গ প্রকাশ ভারতের পরাজয়ের পর সাম্প্রদায়িক উল্লাস। একজন একটি হাইপোথিটিক্যাল প্রশ্ন করেছেন— ফাইনাল খেলাটি যদি ভারত ও ইজরায়েলের মধ্যে হতো এবং ইজরায়েল জিততো, তাহলে বাংলাদেশিরা কী করতো? আমি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি, বাংলাদেশিরা খেলাটি 'বয়কট' করতো, বলতো, এক ভারতের জ্বালায় বাঁচি না, তার ওপর আবার ইজরায়েল!

—**শিতাংশু গুহ,** নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।

সাধ্বী ঋতম্ভরার বাৎসল্য গ্রাম

শুভশ্রী দাস

বৃন্দাবনে প্রায় ৫৪ একর পরিসরে সাধ্বী ঋতম্ভরার 'বাৎসল্য গ্রাম' আশ্রম। এই আশ্রমে অনাথশিশু, মহিলা ও বৃদ্ধদের স্থায়ীভাবে থাকার ব্যবস্থা আছে। আশ্রমের বিশাল প্রবেশ পথের বাঁদিকে দোলনা রাখা আছে, যেখানে যেকোনো ব্যক্তি যেকোনো সময় অবাঞ্ছিত বা অনাথ শিশু রেখে যেতে পারেন। দোলনায় শিশু রেখে যাওয়া ব্যক্তিকে আশ্রমের সঙ্গে সম্পর্কিত সদস্য কোনোরকম প্রশ্ন করবেন না। দোলনায় শিশু রাখতেই দোলনায় লাগানো যন্ত্র আশ্রমের ব্যবস্থা বিভাগে সংকেত পৌঁছে দেবে, সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের কোনো দায়িত্বশীল কর্মী এসে ওই শিশুকে আশ্রমে নিয়ে আসবেন। আশ্রমে প্রবেশ হতেই সেই শিশু বাৎসল্য গ্রাম পরিবারের সদস্য হয়ে যায়। তখন তাকে আর অনাথ বলা যাবে না। ওই আশ্রমেই মা, মাসি, ঠাকুরদা- ঠাকুমা সহ সবপ্রকার আপনজন পেয়ে যাবে। এখানে ছেড়ে যাওয়া প্রত্যেক শিশুর পদবি 'পরমানন্দ' রাখা হয়। পরমানন্দ সাধ্বী ঋতম্ভরার গুরুদেবের নাম।

আশ্রমে শিশুদের জন্য সামবেদ গুরুকুলম্ পাঠশালা আছে। এখানে সিবিএসসি অনুমোদিত পাঠক্রম ব্যবস্থা আছে। শিশুর সাধারণ জ্ঞান বিকাশের জন্য নানারকম প্রাণীর মডেল রাখা আছে। শিশুর নৈতিক শিক্ষার জন্য রামায়ণ-মহাভারত-উপনিষদের প্রসঙ্গ চিত্রাকারে রাখা আছে। শিশুদের প্রাকৃতিক চিকিৎসা এবং যোগ অভ্যাসের মাধ্যমেও চিকিৎসা করা হয়। শিশুদের পঞ্চমশ্রেণী পর্যন্ত আশ্রমের গোকুলমে রাখা হয়। পরে পড়াশুনার জন্য তাদের ভোসলা মিলিটারি স্কুলের মতো ভারতের উচ্চকোটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়।

সদ্য পাওয়া দুটি শিশু কোলে সাধ্বী ঋতম্ভরা।

এই পাঠশালা ছাড়াও আশ্রমের অন্য একটি পাঠশালা আছে। সেখানে বাইরের প্রায় ৩৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী মাসে মাত্র দশটাকা দিয়ে পড়াশোনা করে। এদের স্কুলের ইউনিফর্ম, একবার পেটপুরে ভোজন ও আবশ্যক বইপত্র নিঃশুল্কে দেওয়া হয়। পরিবার দ্বারা লাঞ্ছিত ও পরিত্যক্ত মহিলাদের জন্যও আশ্রমের গোকুলে থাকার ব্যবস্থা আছে। এখানে আয়ু অনুসারে তিনজন মহিলার—মা, মাসি ও ঠাকুমা-সহ এমন এক পরিবার তৈরি করে, প্রত্যেক পরিবারকে বসবাস করা জন্য সমস্ত সুবিধাযুক্ত চার ঘরের একটি বাড়ি দেওয়া হয়। এরকম এক একটি পরিবারের সঙ্গে পাঁচ থেকে দশজন শিশু থাকে। গোকুলমে এরকম ত্রিশটি পরিবার আছে। পরিবারের এই মহিলাদের মাধ্যমে শিশুদের সংস্কার দেওয়া হয়। ভারতীয় রীতিনীতি অনুসারে শিশুদের পালনপোষণ করা হয় এবং সাধারণ আচার-ব্যবহার ও আত্মরক্ষারও শিক্ষা দেওয়া হয়।

পিছিয়ে পড়া সমাজের মহিলাদের জন্য আশ্রমে 'গীতারত্ন' প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে। সেখানে মহিলাদের বড়ি, পাঁপড় তৈরি করা এবং সেলাই, এম্ব্রয়ডারি ইত্যাদি স্বরোজগারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আশ্রমে আইসিইউ-সহ সমস্তরকম চিকিৎসার সুবিধাযুক্ত হাসপাতালও আছে। এখানে আশ্রমনিবাসী ছাড়াও বাইরের গরিব মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। চক্ষু হাসপাতালে বিনাপয়সায় চিকিৎসা করানো হয়।

সাধ্বী ঋতম্ভরা বলেন, "আমি কুড়ি বছর পূর্ব দিল্লির জ্বালানগরে মহিলা সশক্তিকরণ যোজনার অন্তর্গত মহিলাদের স্বরোজগার প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু করেছিলাম। ২০০৩-এ যখন আমি বৃন্দাবনে আসি তখন আশ্রম চালানোর জন্য আমার কাছে কিছুই ছিল না। লোকের সহায়তায় আজ আপনারা এর এত বড়ো রূপ দেখতে পাচ্ছেন।"

সাধ্বী ঋতম্ভরা যাঁর সিংহ গর্জনে ১৯৮৯-'৯০ সালে শ্রীরামমন্দির আন্দোলনকে উচ্চপর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল, সেই তেজস্বিনী সিংহিনীর ভিতরেই বাৎসল্য রসে পরিপূর্ণ মাতৃহৃদয়ও আছে। সমাজের সংবেদনার জন্য তাঁর মাতৃহৃদয় দ্রবীভূত হয়। এই বিশাল হৃদয়ের আধার হিন্দুদের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত; কঠোরভাবে অন্যায়ের মোকাবিলা যেমন করতে পারে তেমন সংবেদনায় দ্রবীভূত হয়ে সমাজের উত্থানের জন্য শক্তিপ্রদান করে থাকে। দিদিমা সাধ্বী ঋতম্ভরার এই 'বাৎসল্য গ্রাম' সমাজের কাছে প্রেরণাস্থল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে চিরকাল। বৃন্দাবনের এই আধুনিককালের রাধিকা সমাজরূপী শ্রীকৃষ্ণের পূজা করে চলেছেন। □

মাইগ্রেনের সমস্যা

ডা: পার্থসারথি মল্লিক

মাইগ্রেন কী—

মাইগ্রেন হলো এক ধরনের স্নায়বিকর অসুখ, যা প্রায়ই মাথার একপাশে বা উভয়পাশে তীব্র ব্যথার সৃষ্টি করে। সঙ্গে থাকে বমি বমি ভাব, আলো ও শব্দের প্রতি অতি সংবেদনশীলতা। মাইগ্রেনের ব্যথা কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। এই ব্যথা হলে রোগীর দৈনন্দিন কার্যকলাপ ব্যাহত হয়। যদিও মাইগ্রেনের কোনো নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। তবে সব স্নায়বিক রোগের মধ্যে এটি সবচেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রণযোগ্য। মাইগ্রেন একটি সাধারণ রোগ হলেও এই রোগের শনাক্তকরণ কম হয়। দেখা গেছে প্রতি পাঁচজন নারীর মধ্যে একজন ও প্রতি ১০ জন পুরুষের মধ্যে ১ জন মাইগ্রেনের সমস্যায় ভোগেন।

কেন হয় এই রোগ—

মাইগ্রেন মস্তিষ্কের কিছু অগতানুগতিক ক্রিয়াকলাপের কারণে ঘটে। যা অনেকগুলি জিনিস দ্বারা ট্রিগার্ড হতে পারে বা সূত্রপাত ঘটে।

- ☐ হরমোনের পরিবর্তন
- ☐ খাবার এবং পানীয়
- ☐ স্ট্রেস এবং উদ্বেগ
- ☐ শারীরিক ট্রিগার
- ☐ পরিবেশগত ট্রিগার
- ☐ মাইগ্রেন জেনেটিকও হতে পারে

উপসর্গ—

মাইগ্রেন, যা শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের পাশাপাশি প্রাপ্তবয়স্কদেরও প্রভাবিত করে। চারটি পর্যায়ে অগ্রগতি করতে পারে, প্রোড্রোম, অরা, আক্রমণ এবং পোস্টট ড্রোম। অবশ্য সকলেরই যে প্রতিটা পর্যায় দেখা যাবে, তার কোনো মানে নেই।

লক্ষণ—

মাইগ্রেনের লক্ষণ ব্যক্তিভেদে পৃথক। প্রায় ২৫ শতাংশ রোগীর একটি বিশেষ অনুভূতি (অরা) হয় যা পূর্বলক্ষণ বা সতর্কতার মতো। এর মধ্যে রয়েছে দেখার এবং কথা বলার অসুবিধা, সঠিক শব্দ চয়নে অসুবিধা, আলোর প্রতি অধিক সংবেদনশীলতা, হাতে বা পায়ে পিন বা সূচ ফোটানোর মতো অনুভূতি, ঘাড়ে ব্যথা, মুখ বা শরীরের একপাশে দুর্বলতা বা অসাড়তা ও কোনো কারণ ছাড়াই অনিয়ন্ত্রিত হাই তোলা।

শিশুদের মাইগ্রেন—

শিশুদের মধ্যে মাইগ্রেন বেশিরভাগ সময় অবহেলিত হয়। প্রাথমিক লক্ষণগুলি প্রকৃত মাইগ্রেন শুরু হওয়ার কয়েকদিন আগে দেখা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কারণ ছাড়াই ঘন ঘন মেজাজ পরিবর্তন ও একটু বেশি সংবেদনশীলতা। শিশুদের মধ্যে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের মধ্যে মাইগ্রেনের প্রকোপ বেশি দেখা যায়। তবে বয়ঃসন্ধিকালের পর মেয়েদের মধ্যে এটি বেশি দেখা যায়।

উপশম—

সচেতনতা মাইগ্রেনের প্রাথমিক রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। কী কী থেকে মাইগ্রেনের সূত্রপাতর হয় তা চিহ্নিত করে সেগুলি এড়িয়ে যাওয়া উচিত।

জীবনযাত্রার কিছু পরিবর্তন জরুরি। যেমন, ঘুম ও খাওয়ার নিয়মমাফিক সময়সূচি মেনে চলা। পর্যাপ্ত জল পান করা। নিয়মিত শারীরিক অনুশীলন করা এবং মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা মাইগ্রেন মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই মাথাব্যথা আরও বাড়ে যদি শারীরিক ক্রিয়াকলাপ বাড়ে।

মাইগ্রেনের কোনো নির্দিষ্ট চিকিৎসা না থাকলেও এখন ওষুধের মাধ্যমে কিছু নতুন চিকিৎসা হচ্ছে। যেমন সিজিআরপি ইনহিবিটার, ল্যাসমিডটান, ট্রিপটান্স। এগুলি মাইগ্রেনের তীব্রতা এবং পুনরাবৃত্তির ঘটনা হ্রাস করতে পারে। আবার নেরিভিওর মতো সরঞ্জামও রয়েছে— একটি ব্যান্ড নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হাতের ওপরের অংশে পরা হয়। যা ব্যথা থেকে মুক্তি দেয়। এছাড়া রয়েছে পোপটাইড, যা ব্যথা উপশম করতে পারে। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় এই রোগ সেরে যাবার সম্ভাবনা থাকে। ☐

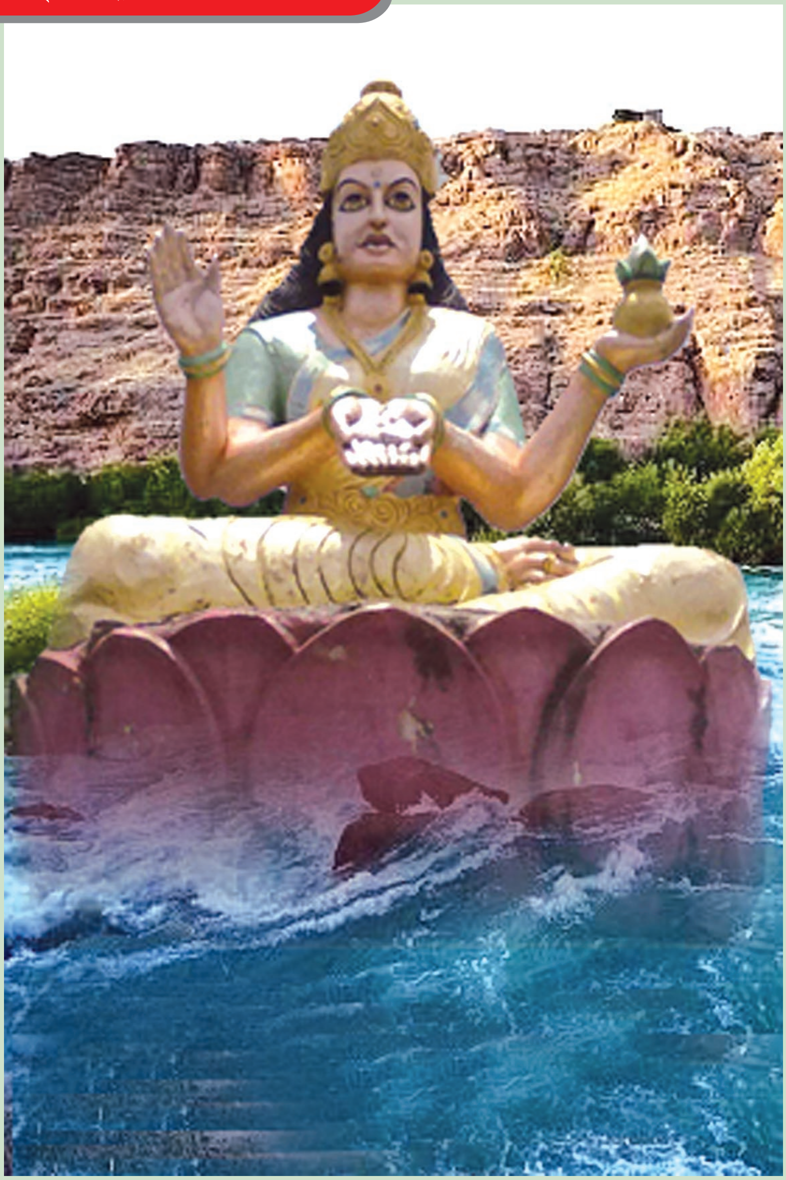

নদী থেকে দেবী

অভিরূপ গঙ্গোপাধ্যায়

নদী থেকে দেবী হয়ে ওঠার উদাহরণ ভারতের ইতিহাসে কম নয়। গঙ্গা, যমুনা, কৃষ্ণা, কাবেরী, নর্মদা ইত্যাদি অনেক নদীই কালক্রমে দেবীত্বে উত্তীর্ণ হয়েছে। সরস্বতীও তার ব্যতিক্রম নয়। ঋকবেদোক্ত সরস্বতী নদী। সরস্বতীকে বর্ণনা করা হয়েছে এক 'সুবিশাল ও পবিত্র' নদী হিসেবে। কিন্তু ঋকবৈদিক যুগের মধ্যবর্তী এবং পরবর্তী সময়ে সরস্বতী বর্ণিত হয়েছে ছোটো নদী হিসেবে। এই পর্যায়ে কোথাও কোথাও সরস্বতীকে বলা হয়েছে সমুদ্র। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সমুদ্র বলতে এখন আমরা যা বুঝি, ঋকবেদের সময়ে শব্দটির মানে তা ছিল না। সমুদ্র বলতে হ্রদও বোঝানো হতো। অর্থাৎ ঋকবেদের সময়েই সরস্বতী তার বিশালতা হারিয়ে হ্রদে পরিণত হয়েছিল।

এখানে একটি প্রশ্ন সঙ্গত কারণেই উঠতে পারে। নদীর হ্রদে পরিণত হওয়ার সঙ্গে তার দেবী হয়ে ওঠার কী সম্পর্ক? ভারতবর্ষ নদীমাতৃক দেশ। সেইসঙ্গে ভারতবর্ষ প্রকৃতিপূজক দেশও। এ দেশের মানুষ নদ-নদী, পাহাড়, অরণ্য, বৃক্ষ— যার কাছেই উপকৃত হয়েছে তাকে দেবতার আসনে বসিয়েছে। অন্তরের কৃতজ্ঞতাই গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী থেকে শুরু করে বট-অশ্বত্থ-তুলসীকে এদেশের মানুষের কাছে দেব-দেবী করে তুলেছে। নদীমাতৃক সভ্যতায় নদী সকল জ্ঞান, গরিমা ও বৈভবের উৎস। সভ্যতাকে ধারণ ও পুষ্ট করে নদ-নদী।

আমরা যদি প্রাচীন বৈদিক সভ্যতা থেকে হরপ্পা সভ্যতার পর্যালোচনা করি তা হলে দেখা যাবে এই সিন্ধু নদ ও সরস্বতী নদী এই সভ্যতাকে পুষ্ট করেছিল। ঘগ্গর ও হাকরা নদীর খাত বদলের কারণে সরস্বতী নদী থর মরুভূমিতে অন্তঃসলিলা হয়ে যাওয়ায় এই সভ্যতা নাগরিক বৈভব ত্যাগ করে গ্রামীণ সভ্যতায় রূপান্তরিত হয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং প্রাচীন ভারতে সভ্যতার বিকাশে সরস্বতীর ভূমিকা সহজেই অনুমেয়। জ্ঞানস্বরূপ নদীর গর্ভেই দেবী সরস্বতীর জন্ম বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন এবং তিনিই কালক্রমে হয়ে ওঠেন জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী আজকের বীণাপাণি সরস্বতী। ■

সরস্বতী মন্দির ও মূর্তির ইতিকথা

সোমকান্তি দাস

ভারত কথার অর্থ ভা অর্থাৎ প্রকাশের জন্য রত। আর তা জ্ঞানের প্রকাশ। জ্ঞানকে যেমন আলোর সঙ্গে তুলনা করা হয় তেমনি তার অন্য রূপটি হলো জলের মতো নির্মল, অবিরত। জলবতী বা সরসবতী বলেই জ্ঞানের দেবী সরস্বতী। নির্মল ও অবিরতধারা রূপে তাই তিনি নদী রূপেও পূজিতা। ভারতের প্রাচীন জ্ঞানের প্রকাশও তাই সরস্বতী নদীতটে হয়েছিল। ধীরে ধীরে তাঁর দেবী রূপে প্রকাশ ঘটে। জ্ঞান ও সত্ত্বগুণের মূর্তরূপ দেবী শ্বেতবসনা, শ্বেত পদ্মাসনা, বীণাবাদিনী। বাহন রূপে রাজহংস, কোনো কোনো স্থানে দেবীকে যুদ্ধের দেবী রূপেও কল্পনা করা হয়েছে এবং সেখানে দেবী অস্ত্রশোভিতা ও ময়ূরবাহনা।

যেখানে জ্ঞানের আরাধনা সেখানেই নির্মাণ করা হয় সরস্বতী মন্দির। গড়ে ওঠে গুরুকুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়। দেশ-বিদেশ থেকে বহু বিদ্যার্থী বিদ্যার্জনের জন্য আসতে শুরু করেন। বিদ্যার সঙ্গে বিদ্যার দেবীও দেশে দেশান্তরে চলে যায়। নাম ও রূপভেদে বিভিন্ন দেশে পূজিত হতে থাকেন।

সাম্রাজ্য বিস্তারের নেশায় পাঠান-মুঘলরা আসতে শুরু করে ভারতবর্ষে। ভারতের বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার দেখে বিস্মিত হয়ে যায়। কিন্তু, সেই বিপুল জ্ঞানভাণ্ডারে যেহেতু কোরান নেই, তাই জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয় তারা। নালন্দা থেকে শুরু করে বড়ো বড়ো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে ফেলে।

প্রাচীন ভগ্ন মন্দির, শিলালিপি, পাণ্ডুলিপি থেকে পাওয়া যায় দেবী সরস্বতীর বর্ণনা।

শারদা পীঠ

পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে রাজা দক্ষ একবার যজ্ঞের আয়োজন করেন। দেব, গন্ধর্ব, যক্ষ, কিন্নর, ঋষি-মুনি, রাজর্ষি-ব্রহ্মর্ষি-দেবর্ষি সকলেই আমন্ত্রিত হলেও কন্যা সতী ও জামাতা মহাদেব ব্রাত্যই রইলেন। পিতার এই বিরাট যজ্ঞানুষ্ঠানে দেবাদিদেবকে আমন্ত্রণ না করাটা ইচ্ছাকৃত তা বুঝতে অসমর্থ দেবীসতী সেই অনুষ্ঠানে যেতে স্বামীর নিকটে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। স্বামী মহাদেব সেখানে যেতে অনিচ্ছা পোষণ করেন এবং দেবীকেও যেতে বারণ করেন। কিন্তু সতী তা অমান্য করে পিতার যজ্ঞানুষ্ঠানে উপস্থিত হন।

যজ্ঞানুষ্ঠানে রাজা দক্ষ সকলের সামনেই ভগবান শিবকে অপমান করতে শুরু করেন। স্বামীর অপমান সহ্য করতে না পেরে দেবী সতী সেখানেই দেহত্যাগ করেন। শিব সেই ঘটনা জানতে পেরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে নিজ জটা থেকে তাঁরই প্রতিরূপ বীরভদ্রকে প্রকট করেন। বীরভদ্র যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে যজ্ঞ ধ্বংস করার পাশাপাশি রাজা দক্ষকেও হত্যা করেন। তারপরেই দেবী সতীর দেহকে তুলে নিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাণ্ডবনৃত্য শুরু করেন।

তাণ্ডবরত বীরভদ্রকে শান্ত করতে সকলে শ্রীবিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। যতক্ষণ দেবীর দেহ বীরভদ্রের কাঁধে রয়েছে ততক্ষণই এই তাণ্ডব চলবে, তাই বিষ্ণু দেবীর দেহকে খণ্ড-খণ্ড করার জন্য সুদর্শন চক্র প্রয়োগ করেন। দেবীর দেহখণ্ড যে যে স্থানে পতিত হয়, সেখানেই শক্তি পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে। যেগুলি শক্তিপীঠ রূপে গড়ে ওঠে।

তেমনি কাশ্মীরের কিষনগঙ্গা নদীতটে (নীলম নদী) দেবীর দক্ষিণ হাত পড়ে এবং শারদা পীঠ গড়ে ওঠে। এই শারদা পীঠ একাধারে শক্তিপীঠ আবার অন্যদিকে বিদ্যার দেবী সরস্বতীর আরাধনার কেন্দ্র। সেখানে বিদ্যালাভের জন্য বহু বিদ্বান সমবেত হতে থাকেন। ধীরে ধীরে সেখানে পণ্ডিতদের সংখ্যাধিক্য ঘটে, তারফলে কাশ্মীর পণ্ডিতদের স্থান বলে বিবেচিত হয়। ঋষি কশ্যপের স্মৃতিবিজড়িত ভূমিতে মহান অদ্বৈতবাদী প্রখর বিদ্বান পণ্ডিত সন্ন্যাসী আদি শঙ্করাচার্য পদার্পণ করেন। আসেন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রবর্তক রামানুজাচার্য।

শারদা পীঠ সেসময় শিক্ষার অন্যতম কেন্দ্র ছিল। ভারতের বাইরে থেকেও বহুজন শিক্ষা গ্রহণের জন্য আসতেন। ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী সেখানে বিরাট

গ্রন্থাগার ছিল। যা প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে পূর্ণ ছিল।

এক সময় ইসলামি আক্রমণের ফলে ধ্বংস হয়ে যায় এই প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত মন্দির, শিক্ষাকেন্দ্র, গ্রন্থাগার এবং বিতাড়িত হতে হয় সেখানকার পণ্ডিতদের। আজ সেই প্রখ্যাত শক্তিপীঠ তথা বিদ্যাকেন্দ্র শারদাপীঠ পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ধ্বংসাবশেষরূপে পড়ে রয়েছে।

ভোজশালা

১০০০-১০৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মধ্যপ্রদেশে পরমার রাজবংশের রাজা ভোজের রাজত্ব ছিল। ভোজরাজা ছিলেন বিদ্যার চরম পৃষ্ঠপোষক, শিক্ষা-সাহিত্যের অনন্য উপাসক। ১০৩৪ সাল নাগাদ তিনি তাঁর রাজ্যের ধারে গড়ে তোলেন এক মহাবিদ্যালয় বা গুরুকুল। তার মধ্যেই স্থাপনা করেন সরস্বতী মন্দির। দূরদূরান্ত থেকে বিদ্যার্থীরা বিদ্যার্জনের জন্য সেখানে আসতে শুরু করেন।

১৩০৫ সালে এই মন্দির-সহ গুরুকুলটিকে আলাউদ্দিন খিলজি ধ্বংস করে। বাগদেবীর মূর্তি-সহ আরও অজস্র মূর্তি খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলে। কোনো কোনো মূর্তি মাটিতে পুঁতে ফেলে। ১৪০১ সালে দিলাবর খান ঘোরি বিখ্যাত এই শিক্ষাকেন্দ্রকে মসজিদে রূপান্তরিত করে। ১৫১৪ সালে মহমুদ শাহ খিলজি বাকি অংশকেও মসজিদের রূপ দেয়। ১৮৭৫ সালে এখানে খননকার্য হয় এবং প্রাচীন এক সরস্বতী প্রতিমা পাওয়া যায়। মেজর কিনকেড সেটিকে লন্ডন নিয়ে যায়। ১৯৩৫ সালে সেখানে নমাজ পড়ার অধিকার দেওয়া হয়। আজও সেখানকার স্তম্ভ, ভগ্ন মূর্তি, শিলালিপি, প্রতীক, যজ্ঞবেদী যেন চিৎকার করে নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ দিচ্ছে।

জ্ঞান সরস্বতী মন্দির, মাণা-উত্তরাখণ্ডের চমোলী জেলায় মাণা

গ্রামে দেবী সরস্বতীর প্রাচীন একটি মন্দির রয়েছে। মান্যতা অনুসারে বদ্রীনাথ থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে এখানেই প্রথম দেবী সরস্বতী প্রকট হন। এখানেই দেবী সরস্বতী নদীরূপে প্রবহমান রয়েছে। এই গ্রাম থেকেই দ্রৌপদী-সহ পাণ্ডবেরা মহাপ্রস্থানের উদ্দেশে যাত্রা করেন।

বারঙ্গল শ্রীবিদ্যা সরস্বতী মন্দির- হংসবাহিনী দেবী সরস্বতীর এই মন্দির অন্ধ্র প্রদেশের মেডক জেলায় অবস্থিত। এটি

কাঞ্চীকামকোটির শঙ্কর মঠ দ্বারা পরিচালিত।

পুষ্কর সরস্বতী মন্দির— রাজস্থানের পুষ্করে দেবী সরস্বতী মন্দির রয়েছে। এখানেই দেবীর নদীরূপের প্রমাণ পাওয়া যায়। দেবীকে

উর্বরতা ও শুদ্ধতার প্রতীক মনে করা হয়।

পনাচিক্কড় সরস্বতী মন্দির— দক্ষিণ মূকাম্বিকা নামে খ্যাত এই মন্দিরটি কেরলের পনাচিক্কড়ে অবস্থিত। মন্দিরটির নির্মাণ করান কিঝেপ্পুরম নম্বুদিরী।

জ্ঞান সরস্বতী মন্দির— তেলেঙ্গানা রাজ্যের নির্মল জেলার গোদাবরীতটে বাসারে অবস্থিত এই সরস্বতী মন্দির। পৌরাণিক কাহিনি অনুযায়ী মহর্ষি ব্যাসদেব মহাভারতের যুদ্ধের পর শান্তির সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। গোদাবরী নদীর তীরে কুমারচলা পাহাড়ে দেবীর আরাধনা করেন। আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে দেবী দর্শন দেন। দেবীর নির্দেশে প্রতিদিন তিনটি স্থানে এক এক মুঠি বালি রাখতে শুরু করেন। যা তিন দেবীমূর্তি— সরস্বতী, লক্ষ্মী ও কালীরূপে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

সিরসা, হরিয়ানা— সরস্বতী নদীপথে হরিয়ানার সিরসাতেও এক সময় বড়ো শিক্ষাকেন্দ্র ছিল তার বহু নিদর্শন প্রত্নতাত্ত্বিক খননে উঠে আসে। পরবর্তীকালে সেখানে দক্ষিণ ভারতীয় শৈলীতে সরস্বতী

মন্দির নির্মাণ করা হয়।

এক সময় বঙ্গপ্রদেশেও বিদ্যার্জনের জন্য দেশ-বিদেশ থেকে বহু বিদ্যার্থী আসতেন। নবদ্বীপের টোল ও বিদ্যালয়ের উল্লেখ বহু সাহিত্যেই দেখতে পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর, বিদ্যারত্ন, তর্করত্ন, তর্কালঙ্কার উপাধিধারী বহু পণ্ডিত বঙ্গের শোভা বৃদ্ধি করেছেন। বিদ্যার আরাধনা যেখানে চলে সেখানে বিদ্যারদেবীর আরাধনাও স্বাভাবিক বিষয়। বসন্ত পঞ্চমীতে সরস্বতী পূজার প্রচলন সারা বঙ্গেই ব্যাপক ধুমধামের সঙ্গে হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। প্রাচীন সরস্বতী মন্দিরও এই রাজ্যে রয়েছে।

শৃঙ্গেরী সারদা মন্দির— শারদা মন্দির বা শারদাম্বা মন্দির জ্ঞান

ও কলার দেবী। আদি শঙ্করাচার্য সপ্তম শতাব্দীতে এই মন্দির নির্মাণ করান।

হাওড়া সরস্বতী মন্দির— হাওড়ার পঞ্চাননতলা রোডসংলগ্ন উমেশ চন্দ্র দাস লেনে রয়েছে শতাব্দীপ্রাচীন একটি সরস্বতী মন্দির। ১৯২৩ সালের ২৮ জুন প্রতিষ্ঠিত হয় এই সরস্বতী মন্দির। এই মন্দিরের বিশেষ একটি রীতি হলো ১০৮টি মাটির খুরিতে বড়ো বড়ো বিশেষ এক ধরনের বাতাসা ও ফল দিয়ে দেবীর পূজা হয়। রাজস্থানে জয়পুরের শ্বেতপাথরে নির্মিত হয়েছে দেবী সরস্বতী। হাঁসের উপর দণ্ডায়মান বীণাপাণিতে পূজা দিতে বসন্ত পঞ্চমীতে শত শত মানুষের সমাগম হয়।

ভারতের বাইরে বহু দেশে সরস্বতী মন্দির ও মূর্তির প্রমাণ পাওয়া যায়।

ব্রহ্মদেশ বা মায়ানমার— মায়ানমারে বৌদ্ধ মত অনুসারে বিদ্যার দেবী সরস্বতীকে ‘থুরাথডী’ নামে উল্লেখ পাওয়া যায়। কিউক্তাওয়াগি বুদ্ধ মন্দিরে এই মূর্তি রয়েছে। স্বর্ণহংসে বিরাজিতা দেবী নিজের ডান হাতে ত্রিপিটক ধারণ করে রয়েছেন।

জাপান— দেবী সরস্বতীর পরিবর্তিতরূপ জাপানে দেখা যায়। ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দী থেকে জল, সময়, শব্দ, ভাষণ, বাকপটুতা, জ্ঞান ও সংগীতের দেবীরূপের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে দেবীর নাম বেঞ্জাইতেন। কমলাসনা দেবীর পাশে ড্রাগন রয়েছে। দেবীর হাতের বাদ্যযন্ত্র বীণাকে ‘বীবা’ বলা হয়.।

কম্বোডিয়া— কম্বোডিয়ার অঙ্কোরভাট মন্দিরে দেবী সরস্বতীর মূর্তি রয়েছে। এই মন্দিরটি সপ্তম শতাব্দীতে নির্মিত। সেখানে দেবীর নাম বাগেশ্বরী বা ভারতী।

শ্যামদেশ বা থাইল্যান্ড— বাকশক্তি প্রদানকারী দেবীরূপে হংসবাহনা ও ময়ূরবাহনা সরস্বতী মূর্তি থাইল্যান্ডে দেখা যায়। দেবী এখানে বাণী, শারদা, বাগেশ্বরী, বেদমাতা প্রভৃতি নামে পরিচিত। বসন্ত পঞ্চমীতে এখানেও দেবীকে আরাধনা করা হয়।

উবুদপুরা তমন কেমুদা, বালি, ইন্দোনেশিয়া— ইন্দোনেশিয়া একসময় অখণ্ড ভারতের অংশ ছিল। শৈলেন্দ্র রাজবংশের রাজারা দীর্ঘ সময় ধরে সেখানে রাজত্ব করেছেন। সেখানকার অধিবাসীরা হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। হিন্দু রীতিনীতি অনুসরণ করতে শুরু করেন।

ইন্দোনেশিয়ার বালিদ্বীপের মধ্যে উবুদপুরা তমন কেমুদাতে ১৯৫১ সালে শুরু হয়ে ১৯৫২-তে নির্মিত হয় সরস্বতী মন্দির। ২০১৩ সালে ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত ইন্দোনেশিয়ার দূতাবাসের সামনে ১৬ ফুট উঁচু সরস্বতী মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে।

সারদাপীঠের ধ্বংসস্তূপ

সিন্ধু-সরস্বতী নদী ব্যবস্থা

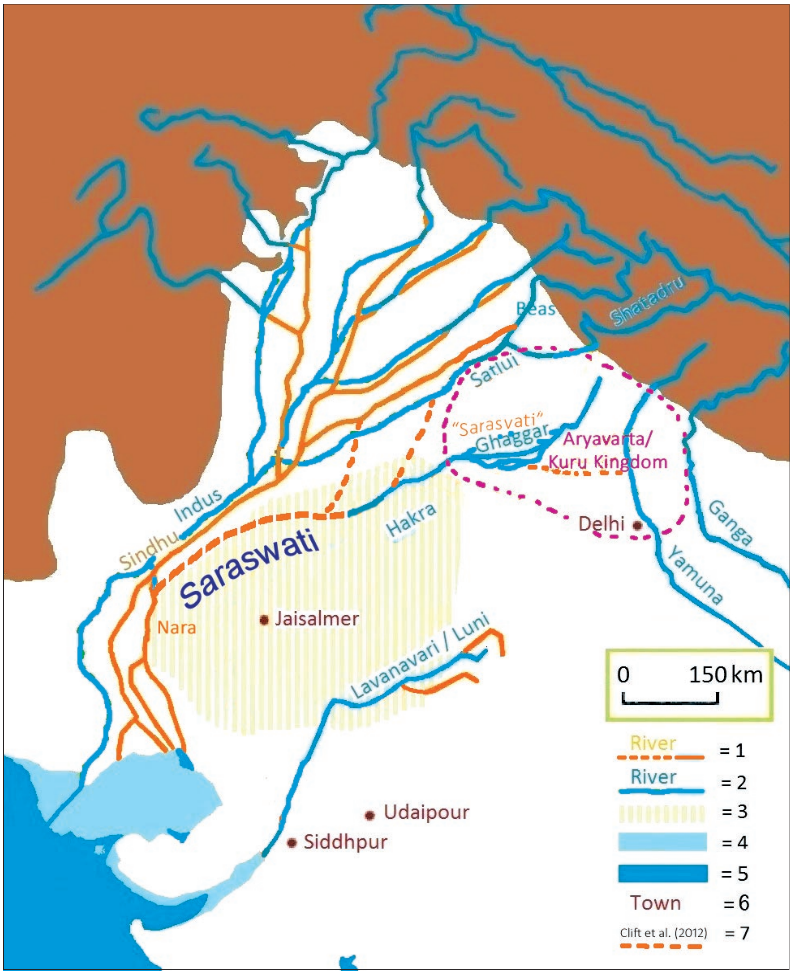

অধুনালুপ্ত সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতা এবং অন্তঃসলিলা সরস্বতী নদী ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্বের নির্দর্শন

অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়

ভূতত্ত্ববিদদের মতে সিন্ধুনদের উদ্গম ও প্রবাহ হিমালয় সৃষ্টির সমসাময়িক। হিমালয়ের বিভিন্ন প্রান্তে প্রাচীন নদীখাতের নিদর্শন সেই প্রমাণ বহন করছে। পশ্চিম তিব্বত-স্থিত কৈলাসপর্বতের অন্তর্গত হিমবাহ হতে সিন্ধুনদের উৎপত্তি। মানস সরোবর হতেও এই নদের একটি ধারা নির্গত হয়েছে। সিন্ধুনদের ছ'টি মূল উপনদী — ইরাবতী, বিপাশা, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, শতদ্রু ও সরস্বতী। বিশ্বের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে এই সপ্তসিন্ধুর প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে। ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডল ব্যতীত সব ক'টি মণ্ডলে সরস্বতী নদীর নামোল্লেখ রয়েছে। জলের অপর নাম জীবন। নদীতীরবর্তী অঞ্চলসমূহেই প্রাচীনকালে বিকশিত হয় মানব সভ্যতা। মানুষের পানীয় ও দৈনন্দিন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জলের উৎস ছিল নানা নদ-নদী। ভারতীয় সংস্কৃতিতে নদ-নদীসমূহকে দেবজ্ঞানে পূজার বিধি ও পরম্পরা বর্তমান।

পুরাণকথা অনুসারে, ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পর থেকে সর্বত্র বিরাজমান ছিল চরম বিশৃঙ্খলা। সেই সময় প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখবিবর হতে আবির্ভূত হন দেবী সরস্বতী। তাঁর আবির্ভাবে ব্রহ্মাণ্ডে স্থাপিত হয় শৃঙ্খলা। তিনি হন ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র বিদ্যা ও জ্ঞানের উৎস। ঋষি মার্কণ্ডেয় রচিত মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবী মহাসরস্বতীর বর্ণনা পাওয়া যায়। তন্ত্রোক্ত দেবীরূপে একজটা, নীল সরস্বতী ও উগ্রতারা পূজিতা হয়ে থাকেন। ঋগ্বেদের নদীস্তুতি সূক্তে (১০.৭৫) এবং সপ্তম মণ্ডলে (৯৫.১-২) ভারতবর্ষে সরস্বতী নদীর অবস্থান ও নদীপ্রবাহের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ, জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ইত্যাদি বৈদিক সাহিত্য এবং বেদ-পরবর্তী সাহিত্যে পাওয়া যায় সরস্বতী নদীর উল্লেখ। ঋগ্বেদে (৩/২৩/৪) সরস্বতী, আপযা ও দৃশদ্বতীর উল্লেখ রয়েছে। ঋগ্বেদ, ব্রাহ্মণ ও কল্প অনুসারে, সরস্বতী ও দৃশদ্বতীর তীরে বৈদিক যজ্ঞ হতো। শ্রীমদ্ভাগবত মতে, দৃশদ্বতী হলো বিশুদ্ধ নদী। বিভিন্ন পুরাণ ও মহাকাব্যে স্বর্গীয় নদী আকাশগঙ্গার উল্লেখ পাওয়া যায়। আকাশগঙ্গা মর্ত্যলোকে সরস্বতী নদী রূপে অমরত্ব ও স্বর্গলোকের পথস্বরূপা।

বিশ্বের সেই প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায় দক্ষিণ এশিয়াস্থিত ভারতবর্ষের সপ্তসিন্ধুর দুই তীরে, যা 'সিন্ধু সভ্যতা' বা 'সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতা' নামে পরিচিত। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের মধ্য দিয়ে একদা প্রবাহিত সরস্বতী নদীর অববাহিকায় বিকশিত হয়েছে এই সভ্যতা। ঋগ্বেদে সরস্বতী শুধুমাত্র নদী নয়, তিনি সরস্বতী দেবী। তাঁর সম্বন্ধে স্তুতি স্বরূপ ঋগ্বেদে ৬০টি ঋক্ বা মন্ত্র রয়েছে, যেগুলির ভিত্তিতে অধুনা বিজ্ঞানী ও প্রত্নতত্ত্ববিদরা প্রাচীন সরস্বতী সভ্যতাকে আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছেন। এই সকল স্তুতিকে ভিত্তি করে সংঘটিত বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণায়

ফঃ ৪

পরিষ্কার যে, একদা বিশাল সরস্বতী নদীর কৃপায় মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করেছিল, অফুরন্ত ধনসম্পদ সঞ্চিত হয়েছিল; সেই নদী বিদ্যা,বুদ্ধি, ধন ও জ্ঞানের দেবী রূপে পূজিতা হয়েছিলেন এবং আজও সমগ্রে ভারতে হয়ে থাকেন। এই নদী উত্তর-পশ্চিম ভারতে যেভাবে জল সিঞ্চন করেছিল, যে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সম্পদ দান করেছিল, তা পরোক্ষে ব্যাপক বিদ্যাচর্চায় এবং বেদের উৎপত্তিতে সহায়ক হয়। ঋগ্বেদ নিজেকেই মা সরস্বতীর সন্তানরূপে অভিহিত করেছে।

ঋগ্বেদের সূক্তাংশ (ঋ. ৭৯৫।২) অনুসারে সরস্বতী নদী হিমালয় পর্বতমালা হতে উৎপন্ন হয়ে সমুদ্রে মিশেছে। সিন্ধুক্ষিৎ ঋষি ভারতবর্ষে পূর্বদিক থেকে প্রথমে গঙ্গা, তারপর যমুনা, তারপর সরস্বতী এবং তারপর শতদ্রু নদীর নাম উল্লেখ করেছেন (ঋ. ১০।৭৫।৫)। অর্থাৎ, সরস্বতী ছিল যমুনা ও শতদ্রু নদীর মধ্যবর্তী, তথা সিন্ধু নদের পূর্বদিকে প্রবাহিতা। মধুচ্ছন্দা ঋষি ও ভরদ্বাজ ঋষির বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সরস্বতী ছিল প্রবল বেগবতী ও বলশালিনী নদী, যার অপরিমিত, দৃপ্ত, অপ্রতিহত গতি ও জলবর্ষী বেগ প্রচণ্ড শব্দে উত্তর-পশ্চিম ভারতের বুকে ছিল প্রবহমান, যার তরঙ্গ ভেঙে দিত পর্বতসানুসকল (ঋ. ৬।৬১।২, ঋ. ৬।৬১৮)। এই নদী প্রবাহিত হয়ে ভারতভূমিকে করে তুলেছিল উর্বর, ঘটিয়েছিল বনসৃজন। এর ফলে সৃষ্ট হয় তপোবন, তার মাধ্যমে হয় সকল জ্ঞান উদ্দীপন (ঋ. ১।৩।১২)। তিনি ছিলেন অন্নদাত্রী সরস্বতী দেবী, যিনি মানবগণকে ভূমি দান করেছিলেন, এবং তাদের জন্য করেছিলেন বারিবর্ষণ (ঋ. ৬।৬১৩)। অর্থাৎ, সরস্বতীর পলি মাটির মাধ্যমে সৃষ্ট অতি উর্বর কৃষিজমি তৎকালীন মানুষকে ভূমিদান শুধু নয়, কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সেচ ও পানীয় জলেরও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করেছিল। উদ্বৃত্ত কৃষিসম্পদই সভ্যতার উন্নতিসাধন করেছিল। এই নদীর প্রতি প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও প্রার্থনা তাই বারবার উচ্চারিত হয়েছে মুনি-ঋষিদের কণ্ঠে, ঋগ্বেদের সূক্তাবলীতে।

ভারতবর্ষের একটি অন্যতম শক্তিশালী ও পবিত্র নদী হলো সরস্বতী। কালক্রমে এই নদীটি তার উদ্গমস্থল হতে আরব সাগরে মিলনস্থল পর্যন্ত অংশে একটি বিমূর্ত নদীরূপে পর্যবসিত হয়েছে। প্রয়াগের ত্রিবেণী সঙ্গমে দুই পবিত্র নদী--- গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গে অন্তঃসলিলা সরস্বতী মিলিত হয়েছে বলে ভারতীয়দের আস্থা ও বিশ্বাস। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে কলহণ রচিত কাশ্মীরের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ 'রাজতরঙ্গিনী'তে সারস্বত ব্রাহ্মণদের কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণদের পাঁচটি বিভাগের একটি হলেন এই সারস্বত ব্রাহ্মণেরা। সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর ভাগের বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে বসতি স্থাপন করেছিলেন এই সারস্বত শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা। তাঁদের একটি অংশ সিন্ধু প্রদেশের দক্ষিণ উপকূলভাগ এবং গুজরাতের উপকূল অঞ্চলে বসবাস করতেন। দেশ বিভাজনের পরবর্তী পর্যায়ে তাঁরা হয়ে পড়েন শরণার্থী। তাঁদের অধিকাংশই মহারাষ্ট্রে চলে আসেন। আরেকটি অংশ অবিভক্ত পঞ্জাব ও কাশ্মীর উপত্যকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বসবাস করতেন। তাঁদের একটি বড়ো অংশ দেশভাগের পর ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আরেকটি অংশ, যাঁরা গৌড় সারস্বত ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত, বর্তমান ভারতের কোঙ্কন উপকূল বরাবর তাঁদের বাস। মূর্ধাভিষিক্ত বা ব্রহ্মক্ষত্রিয়রা হলেন সারস্বত ব্রাহ্মণ শ্রেণীর অন্যতম সম্প্রদায় যাঁরা একই সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য আচার এবং ধর্ম ও ব্রাহ্মণকুলকে রক্ষা করেছিলেন। বঙ্গভূমির বৈদ্যব্রাহ্মণেরা মূলত সারস্বত শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। নয়ডা ও আগ্রাতে বসবাসকারী সারস্বত ব্রাহ্মণরা মনে করেন দশগ্রীব রাবণও ছিলেন সারস্বত ব্রাহ্মণ, কারণ তাঁর পিতা ছিলেন ঋষি বিশ্রবা। মহারাষ্ট্র, গোয়া ও কর্ণাটক নিবাসী সারস্বত ব্রাহ্মণদের মধ্যে গৌড় সারস্বত ব্রাহ্মণরা হলেন মাধবাচার্যের অনুগামী এবং বৈষ্ণব মতাবলম্বী। অন্যান্য সারস্বতরা স্মার্ত ও আদি শঙ্করাচার্যের অনুগামী।

ভারততত্ত্ববিদ্‌দের মতে, বৈদিক নদী সরস্বতী এবং ব্রহ্মাবর্ত রাজ্যের মধ্য দিয়ে দৃশদ্বতী নদী প্রবাহিত হতো। মনুস্মৃতি অনুসারে, বৈদিক যুগে সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদীর সঙ্গমস্থল ব্রহ্মাবর্তে ঋষিরা বেদ এবং অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেছেন। লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্রে এটি মৌসুমী নদী এবং সরস্বতী বহুবর্ষজীবী নদী রূপে বর্ণিত হয়েছে। ব্রহ্মাবর্তে রচিত ব্রাহ্মণগ্রন্থে দৃশদ্বতীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থগুলি অনুসারে, ব্রহ্মার কমণ্ডলুনিঃসৃত পুষ্কর হ্রদে নদীটির উৎপত্তি। স্থানটি বর্তমানে আজমীঢ়ের নিকটবর্তী। পুষ্করের নিকটবর্তী পর্বতে উৎপন্ন হয়ে সরস্বতীর চারটি শাখা বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়। দৃশদ্বতী ছিল উত্তর দিকে প্রবাহিত শাখা। ঋগ্বেদ রচয়িতা ও সংকলনকারী ঋষিদের অধিকাংশের আশ্রম ছিল এই নদীর তীরে, ব্রহ্মাবর্তের পুষ্কর ও ধোসি পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে। আধ্যাত্মিক কার্যক্রমের জন্য সমকালীন মানুষের গন্তব্যস্থল ছিল দৃশদ্বতী নদী। মনুস্মৃতিতে দৃশদ্বতী ও সরস্বতী নদী ব্রহ্মাবর্তের সীমানা সংজ্ঞায়িত করেছে বলে বিবরণ পাওয়া যায়। মনুস্মৃতিতে আরও বলা হয়েছে যে, সরস্বতী কুরু প্রদেশের উত্তর সীমারেখা নির্ধারণ করলেও, দৃশদ্বতী কুরু রাজ্যের দক্ষিণে এবং ব্রহ্মাবর্তের উত্তরে প্রবাহিত হয়েছিল। মহাভারত অনুসারে, কুরু রাজ্যের দক্ষিণ সীমায় ছিল গুরু দ্রোণাচার্যের আশ্রম। বর্তমানে গুরগাঁও (গুরুগ্রাম)-এর এক প্রান্ত এবং রোহতক ও ঝজ্জরের অপর প্রান্তে স্থানটি অবস্থিত। গুরুগ্রাম শহরের দক্ষিণ দিকে একদা দৃশদ্বতী প্রবাহিত হতো। মহাভারত ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থে প্রাচীন 'গান্ধার' রাজ্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। সেই রাজ্যে হরাক্ষবতী নদীর অস্তিত্বের নানা উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমানে গান্ধার 'কান্দাহার'-এ পরিণত হয়েছে। আফগানিস্তানের হেলমন্দ নদীটিই প্রাচীন 'হরাক্ষবতী' বলে অনেক গবেষকের মত। এইভাবে সরস্বতী নদীটিকে দক্ষিণ আফগানিস্তানের হেলমন্দ বা হরাক্ষবতী নদী হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

আদি শঙ্কর কাশ্মীরস্থিত সারদাপীঠে পৌঁছে শক্তি-শ্রীচক্র সম্পর্কিত জ্ঞান ও বিদ্যা অর্জন করেন। 'শঙ্কর দিগ্বিজয়' গ্রন্থে এই বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে। দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক হলেন শ্রীশ্রী আদি শঙ্কর। এই পরম্পরার অন্তর্গত দশটি সন্ন্যাসী সম্প্রদায় হলো— পুরী, গিরি, ভারতী, সরস্বতী, তীর্থ, বন, অরণ্য, সাগর, পর্বত ও আশ্রম। বৈদিক, বৈদান্তিক ও যৌগিক সিদ্ধান্ত আধারিত অধ্যাত্মমার্গে পরিচালিত দশনামি সন্ন্যাসী

সম্প্রদায়ের সাধনাদর্শ হলো অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অপরিগ্রহ ও ব্রহ্মচর্য। আদি শঙ্কর প্রবর্তিত এই ব্যবস্থার অন্তর্গত অন্যতম পরম্পরা হলো 'সরস্বতী'। এই পরম্পরার উল্লেখযোগ্য সন্ন্যাসীরা হলেন মধুসূদন সরস্বতী, দয়ানন্দ সরস্বতী, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সরস্বতী, শঙ্করাচার্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী, শঙ্করাচার্য স্বামী স্বরূপানন্দ সরস্বতী, শঙ্করাচার্য শ্রী জয়েন্দ্র সরস্বতী, শঙ্করাচার্য স্বামী নিশ্চলানন্দ সরস্বতী, শঙ্করাচার্য স্বামী সদানন্দ সরস্বতী, স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী, স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ সরস্বতী প্রমুখ।

সমগ্র বিশ্বে মানব সভ্যতার উৎসস্থল হলো ভারতবর্ষ। ইতিহাসবিদ উইল ডুরান্ট বলেছেন, 'India was the mother of our race and Sanskrit the mother of Europe's languages. She was the mother of our philosophy, mother through the Arabs, of much of our mathematics, mother through Buddha, of the ideals embodied in Christianity, mother through village communities of self-government and democracy. Mother India is in many ways the mother of us all.'

ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব সরস্বতী সভ্যতার সময়ের নিরিখে কিছুটা অনুধাবন করা যায়। ঋগ্বেদ সৃষ্টির আগেও প্রাচীন ঋষিগণ তথা তাঁদের পূর্বপুরুষেরা সরস্বতী উপকূলে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছিলেন, তারও ইঙ্গিত পাওয়া যায় ভরদ্বাজ ঋষির উচ্চারিত ঋকে (ঋ. ৬।৬১।১০), যেখানে তিনি 'সপ্তনদীরূপ সপ্তভগিনীসম্পন্না প্রাচীন ঋষিগণ কর্তৃক সম্যকরূপে সেবিতা আমাদের প্রিয়তমা সরস্বতী দেবী যেন নিয়ত আমাদের স্তুতিভাজন হন'— এই প্রার্থনা করেছেন। বিশ্বের ইতিহাসের বহু প্রাচীন রাজা, রাজ্য, জনপদ সরস্বতী সভ্যতার অবদান। ইতিহাসখ্যাত রাজা নহুষ ও চিত্র, দু'জনেই রাজত্ব করেছেন সরস্বতী নদীর উপকূলে। বিশ্বের জীবদের প্রতিপালনের কথা ভেবে সরস্বতী নদী রাজা নহুষকে ঢেলে দিয়েছিলেন খাদ্যসম্পদ (ঋ. ৭।৯৫।২)। একইভাবে, রাজা চিত্রকে মেঘ, বৃষ্টি ও অযুত ধন দানের মাধ্যমে প্রজাদের করেছিলেন প্রীত (ঋ. ৮।২১।১৮)।

খননকার্যে প্রাপ্ত সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতা

এছাড়াও, অন্যান্য রাজা যথা— ভবরাজ্য ও পুরুর শাসনাধীন প্রজারা সরস্বতী নদীতীরে বসবাস করতেন। গবেষকদের ধারণা, বর্তমান সরস্বতীর খাতেই প্রবাহিত হতো প্রাচীন ভাগীরথী। পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলাতেও রয়েছে পুণ্যভূমি ত্রিবেণী। মাঘী পূর্ণিমা তিথি উপলক্ষ্যে সেখানে আয়োজিত হয় কুম্ভমেলা। পূর্ণ ও অর্ধকুম্ভে প্রয়াগরাজে কুম্ভস্নানের মতোই পশ্চিমবঙ্গের ত্রিবেণী কুম্ভে মাঘী পূর্ণিমায় পুণ্যস্নানের বিধি ও প্রাচীন পরম্পরা রয়েছে। ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলে এবং যজুর্বেদে সরস্বতীর বিলুপ্ত হওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ববিদ ড. কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিতের মতে যমুনা ও শতদ্রু প্রকৃতপক্ষে সরস্বতীর উপনদী। এই নদীগুলি তাদের গতিপথ পরিবর্তনের কারণে নদীতীরবর্তী সভ্যতা জলসংকটের সম্মুখীন হয়। নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার জনজীবন হয় বিপর্যস্ত। রাজস্থানের কালিবঙ্গান, গুজরাতের ধলাবীরা, হরিয়ানার রাখিগড়ি হলো সরস্বতী নদী অববাহিকায় বিকশিত উল্লেখযোগ্য সমৃদ্ধ জনপদসমূহ। ১৯২২ সালে এই সভ্যতা আবিষ্কার করেছিলেন প্রত্নতাত্ত্বিক ড. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৪১ সাল থেকে বহু বৈজ্ঞানিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে সরস্বতী নদী ও সভ্যতা সম্পর্কে বহু তথ্য জানা গিয়েছে। ব্রিটিশরা এই সভ্যতার নামকরণ করে হরপ্পা সভ্যতা। বিজ্ঞানী অরেল স্টাইন (১৯৪১), হেনরি ফিল্ড (১৯৫৫)-এর গবেষণা ছাড়াও আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (এএসআই), নাসা ও ইসরো প্রভৃতি সংস্থার দ্বারা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, খননকার্যের মাধ্যমে উঠে এসেছে নানা নতুন তথ্য। উত্তর-পশ্চিম ভারতের একটি বড়ো অংশে (বর্তমানে পাকিস্তানের) চোলিস্তান মরুভূমিতে প্রায় ৩০০ মাইল সরস্বতীর গতিপথ অনুসন্ধান করে, প্রাগৈতিহাসিক সরস্বতী নদীর ভৌত সমতুল (ফিজিকাল ইকুইভ্যালেন্ট)-এর নির্ণয় অনুসারে এখনও পর্যন্ত ১০৭৪টি সভ্যতাস্থান ও প্রাচীন সরস্বতী নদীর গতিপথের মানচিত্র তৈরি হয়েছে। রেডিয়ো-কার্বন পরীক্ষা পদ্ধতি অনুসারে এই সভ্যতা হতে প্রাপ্ত ও সংগৃহীত নিদর্শনগুলির সময়কাল নির্ধারিত হয়েছে।

সরস্বতী নদী কোনো কোনো স্থানে প্রস্থে ছিল ২২ কিমি এবং শক্তিশালী নদীরূপে ঋগ্বেদে সরস্বতী সংক্রান্ত যে তথ্য পাওয়া যায় তা আজ প্রমাণিত ও বৈজ্ঞানিক সত্য। সরস্বতী নদীর উভয় কূলেই বিকশিত হয় সভ্যতা।

মানুষের বসতি ছিল নদী উপকূলে উঁচু সমতল এলাকায়। সেই সময়ে তৈরি মৃৎপাত্রগুলি রঙিন, কারুকার্যখচিত ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। লাল, চকোলেট, কালো, কমলা ও গেরুয়া রঙের ব্যবহার শুধু নয়, মৃৎপাত্রকে পালিশ করে উজ্জ্বল করার পদ্ধতিও তৎকালীন মানুষেরা জানতেন। জানতেন চাকা ঘুরিয়ে সেই সকল পাত্র তৈরি করতে। সরস্বতী সভ্যতা থেকে পাওয়া গিয়েছে ভগবান পশুপতিনাথের মূর্তি, গোরু (গোমাতা) ও ষাঁড়ের (নন্দীর) মূর্তি। পাওয়া গিয়েছে কচ্ছপের শক্ত খোলা, পোড়া মাটির হাতের বালা, শস্য গুঁড়ো করার পাথরের খণ্ড। এছাড়াও দু'দিকে ধারালো ছোটো- বড়ো ছুরি, তিরের ফলা, ঘষার পাথর প্রভৃতিও পাওয়া গিয়েছে সপ্তম সহস্রাব্দের সরস্বতী সভ্যতায়।

পঞ্চম সহস্রাব্দের সরস্বতী সভ্যতাকে ইংরেজরা নামকরণ করে হরপ্পা সভ্যতা। মহেঞ্জোদড়ো, চানহুদড়ো, সিরসা, রোহতাস, লোথাল প্রভৃতি সভ্যতাকেন্দ্রবিশিষ্ট এই সভ্যতা ৩০০০ বছর আগে পর্যন্ত অস্তিত্ব ছিল। এই সময়কালের মধ্যে সভ্যতা তার আয়তনে ও জনপদে সংখ্যায় বাড়তে থাকে। ঘটতে থাকে নগরায়ন। এই কালখণ্ডে মানুষ সরস্বতী নদীতীরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন, বাড়তে থাকে বহুমুখী, গুণকর্মভিত্তিক বসতির অনুপাত। নানা প্রকার কুটিরশিল্প, হস্তশিল্পের বিকাশ এই সময়ে ঘটতে থাকে, উন্নততর হয়ে ওঠে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনশৈলী। বর্তমান চোলিস্তান মরুভূমি হতে প্রাপ্ত গমনওয়ালা বসতি, জলওয়ালি বসতি ও গণউরিওয়ালা নগরের অস্তিত্ব সরস্বতী এবং পরবর্তীতে হরপ্পা সভ্যতার সাক্ষ্য বহন করে। সরস্বতী সভ্যতা এই সময়কালেই ক্রমশ উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সরতে থাকে। উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের গুণমান অক্ষুণ্ণ রাখার তাগিদে কাজের দক্ষতাবৃদ্ধির উপরে বেশি গুরুত্ব আরোপিত হতে থাকে, বিভিন্ন স্থানের মধ্যে শুরু হয় বিনিময় বা বাণিজ্য। ক্রমে তা ছড়িয়ে পড়েছিল বালুচি পাহাড়ের পাদদেশে এবং সিন্ধু সাগরের (আরব সাগরের) উপকূলে। ফলে শুরু হয়েছিল দূরবর্তী সমুদ্রবাণিজ্য। এই সময়কালের (বিগত ৫০০০-৩০০০ বছর) যে মৃৎপাত্রগুলি পাওয়া যায়, সেগুলি ছিল চাকা ঘুরিয়ে তৈরি, ওজনে হালকা, পেট মোটা ও কারুকার্যসমন্বিত। এই সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া গিয়েছে বহু মাতৃদেবীর মূর্তি, যার সঙ্গে বর্তমান ভারতে পূজিত দেবীমূর্তির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। পোড়ামাটির ছোটো ছোটো খেলনা মূর্তি ছাড়াও দু'টি রূপের নারীমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। কতকগুলি শান্ত, সুন্দর রূপ, অন্যগুলির রূপ ভয়ংকর। ভয়ংকরী মূর্তিগুলিকে ঐতিহাসিক জন মার্শাল ভয়ংকর কালীমূর্তির আদিরূপ বলে মতপ্রকাশ করেছেন।

বিগত চতুর্থ সহস্রাব্দের মধ্যকাল থেকে পরবর্তী ৫০০ বছরে হিমালয়ের হিমবাহগুলির জলধারা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসে। প্রাকৃতিক কারণে সরস্বতী নদীর জলের উৎস সংকটাপন্ন হওয়ার কারণে নদীর গতিপথ হয় পুরোপুরি রুদ্ধ। এরফলে সরস্বতী নদী বিলুপ্ত হয়। থর মরুভূমি চোলিস্তানস্থিত জনপদ ও বসতিসমূহকে গ্রাস করে। মরুভূমির আবহাওয়া সৃষ্টি হওয়ার দরুন বিগত তৃতীয় সহস্রাব্দে স্থানীয় মানুষ সরস্বতী উপত্যকা ত্যাগে বাধ্য হলেন। অবলুপ্ত ও মৃত সরস্বতী নদীর নামে 'বিনশন তীর্থ'-স্থানের নাম রয়েছে মহাভারতের শল্যপর্বে। এই মহাভারতেই প্রাচীনকালে সরস্বতীর তীরে বিশাল যজ্ঞের উল্লেখ রয়েছে।

হরিয়ানার হিসার জেলাস্থিত রাখিগড়িতে প্রাপ্ত পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং মানব জীবাশ্ম হতে সংগৃহীত ডিএনএ পরীক্ষা হতে প্রাপ্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে কতিপয় পশ্চিমি ঐতিহাসিক বর্ণিত 'আর্য আক্রমণ তত্ত্ব'টি সাম্প্রতিক অতীতে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এই কারণে স্কুলস্তরের পাঠ্যক্রম হতে সেটিকে বাদ দিয়েছে এনসিইআরটি। ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গিয়েছে যে এই নমুনাটি প্রায় দশ হাজার বছর প্রাচীন। এই ডিএনএ-র সঙ্গে অন্যান্য ভারতীয় জাতি, উপজাতির ডিএনএ-র পুরোপুরি মিল রয়েছে এবং এই একই ডিএনএ দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর মধ্যেই পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা বর্তমানে এই তত্ত্বে উপনীত হয়েছেন যে, খাদ্যাভাব ও জলসংকটের কারণে সরস্বতী সভ্যতার মানুষ ভারতের দক্ষিণাংশে, ইরানে এবং মধ্য এশিয়ার নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন। আফগানিস্তান হতে কর্ণাটকের আদিত্যানেল্লুর পর্যন্ত সরস্বতী সভ্যতার অসংখ্য নিদর্শন পাওয়া যায়। বাগ্‌দেবীর আরাধনায় রত ভারতবাসী আজকের দিনে দাঁড়িয়ে পেয়েছে সত্যের সন্ধান। মা সরস্বতী সকল ভারতীয়ের হৃদয়-সিংহাসনে বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে বিরাজ করেন, তিনি সকলের উত্তরণ ঘটাবেন অন্ধকার হতে আলোর দিকে, অসত্য হতে সত্য অভিমুখে এবং অবশ্যই মৃত্যু হতে অমৃতের অভিমুখে।

তথ্যসূত্র:

১. প্রবন্ধ: 'সরস্বতী সভ্যতা পৃথিবীর এক প্রাচীনতম সভ্যতা'। লেখক: ডাঃ শিবাজী ভট্টাচার্য।

২. 'পুরাতত্ত্বের আলোতে প্রস্তর যুগ থেকে জন্ম ভারতের সভ্যতা (মেহরগড়-সরস্বতী-হরপ্পা)' : ড. কৃষ্ণকান্ত সরকার।

বেদ-পুরাণে সরস্বতী

নন্দলাল ভট্টাচার্য

নামান্তরে অংশুমতি

চুরি হয়ে গেছে সুরলোকে। খোয়া গেছে দেবভোগ্য সোম। চারিদিকে তাই হইচই। বিচলিত সকলেই। সোম হলো দেবরাজ এবং অন্যান্য সব দেবতার সবচেয়ে প্রিয় পানীয়। সেই দেবভোগ্য পানীয়ই অপহৃত। আর অপহরণ করেছে এমন একজন যে কিনা ওই সোম রক্ষাকারীদেরই একজন।

দেবলোকে সোমের ভাণ্ডারী ছিল গন্ধর্বরা। ওই সোম রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল তাদেরই। অথচ সেই গন্ধর্বদেরই একজন, বিশ্বাবসু যার নাম, সে কিনা চুরি করেছে ওই সোম। লুকিয়ে রেখেছে তা জগের নীচে। সেখানে রেখেছে তার নিজস্ব প্রহরী।

খবরটা জানার পর সকলেরই প্রথম প্রতিক্রিয়া— এ তো রক্ষকই ভক্ষক। পরন্তু এই সোম উদ্ধার করার শক্তি যে তাদের নেই। তাই ক্ষণিক বিভ্রান্তি। তারপরই দেবরাজ ইন্দ্র যান দেবী সরস্বতীর কাছে। বলেন, যে করেই হোক ওই সোম উদ্ধার করে দিন আমাদের।

সব শুনে রাজি হন সরস্বতী। তিনি অবশ্য তখন রয়েছেন বাক্ রূপে। গন্ধর্ব বিশ্বাবসুর কাছ থেকে সোম উদ্ধার করার জন্য তিনি নিলেন কপটতার আশ্রয়। তিনি জানেন, সুন্দরী যুবতীদের প্রতি রয়েছে গন্ধর্বদের একটা দুর্বলতা। তার সুযোগ নিতেই বাক হলেন চপল, চটুল, অপরূপা। আর সেই রূপের ছটায় বিশ্বাবসু এবং অন্যান্যদের বিমুগ্ধ করে তিনি সোম উদ্ধার করে ফিরে আসেন দেবলোকে। তাই নাম হয় তাঁর অংশুমতি।

সরস্বতী বা বাক্‌দেবী সম্পর্কে এ কাহিনি রয়েছে যজুর্বেদে এবং ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণে। কেউ কেউ মনে করেন সরস্বতীই মোহিনী রূপে অসুরদের বঞ্চিত করেছিলেন অমৃত থেকে।

জ্ঞানদায়িনী তিনি অন্নদাও

ঋক, যজু, অথর্ব— এই তিন বেদেই আছে সরস্বতীর কথা। ঋগ্বেদে সরস্বতী সম্পর্কিত যেসব সূক্ত ও ঋক রয়েছে তাতে দেবীর অবয়বের কোনো বর্ণনার সন্ধান

পাওয়া যায় না। কিন্তু ওইসব সূক্ত ও ঋকে যেমন গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে, তার থেকে দেবী সরস্বতীর একটি মানস মূর্তি অবশ্যই গড়ে তোলা সম্ভব।

ঋগ্বেদের মন্ত্র থেকে জানা যায়, সরস্বতী হলেন যজ্ঞস্বরূপা। তিনি জ্যোতির্ময়ী। তাঁর দিব্য বিভায় আলোকিত ত্রিলোক। তাঁর মতো দয়াবতী ও দানী খুব কমই আছে। সবরকম পার্থিব ও দৈব সম্পদ দান করেন তিনি ভক্তদের। বিদ্যা, জ্ঞান, ধীশক্তি দানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি অন্নদাত্রী রূপে সকলকে দেন অন্ন। পাবনী তিনি সকলের অন্তরকে করেন শুদ্ধ। প্রার্থনা অনুযায়ী কাউকে দেন বৈভব, কাউকে পুত্র। তাঁরই কৃপায় রাজা বর্ধ্যশ্ব পেয়েছিলেন জ্ঞানী, শক্তিশালী পুত্র দিবোদাসকে।

আপাতরূপে তিনি মনোহরা, শান্ত, লাবণ্যময়ী। সুধাময়ী নদীর সহস্রজলধারার মতোই হয়ে বিশ্বের জ্ঞানসমুদ্রকে পরিপূর্ণ করে চলেছেন। সেইসঙ্গে সকলকে বিদ্যা বিভূতির বিজলি বিভায় উদ্ভাসিত করে চলেছেন। সকলকে করেছেন উন্নতশির— উন্নতচিত্ত।

সুস্থ করেন ইন্দ্রকে

ঋগ্বেদে যে তিন দেবী সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছেন তাঁরা হলেন— অদিতি, ঊষা ও সরস্বতী। দশটিরও বেশি সূক্তে রয়েছে সরস্বতীর কথা। এর মধ্যে তিনটি সূক্তে (৬।৬১, ৭।৯৫ এবং ৭।৯৬) রয়েছে কেবলই সরস্বতীর স্তুতি। এই কারণে এই তিনটিকে সরস্বতীস্তোত্র বলেও অভিহিত করা যায়। এর বাইরে বিভিন্ন সূক্তের এক বা একাধিক মন্ত্রে রয়েছে সরস্বতীর কথা। আর তার থেকেই বোঝা যায়, বৈদিক ঋষিদের কতটা ঋদ্ধ ও প্রভাবিত করেছিলেন দেবী সরস্বতী।

সরস্বতী সম্পর্কে ঋগ্বেদে অত কথা বললেও তাঁর অবয়বের কোনো স্পষ্ট বর্ণনা নেই কোথাও। সর্বত্রই রয়েছে তাঁর নানা গুণের কথা। সেই সূক্তেই এক জায়গায় তাঁর তুলনা করা হয়েছে মহাদ্রুমের সঙ্গে। গাছ যেমন বিভিন্ন প্রাণীকে আশ্রয় দেয়, দেবী সরস্বতীও সেইভাবেই মানুষকে জ্ঞানবুদ্ধিতে সুপরিচালিত করে নানাভাবে হয়ে ওঠেন তাদের অবলম্বন ও আশ্রয়দাত্রী। শরণাগতদের তিনি করেন অশেষ কল্যাণ— তব শর্মন্ প্রিয়তমে দধানা উপস্থেয়াম্ শরণং ন বৃক্ষম্ (৭।৯৫।৫)। তিনি সকলের ধীশক্তির সংবৃদ্ধি ঘটান— শং সরস্বতী সহধী ভিরস্ত (৭।৩৫।১১)।

ঋগ্বেদে দেবী সরস্বতীকে জ্ঞান-বুদ্ধি-বিদ্যা-সংগীত-নৃত্য ইত্যাদির অধিষ্ঠাত্রী হিসেবে স্তুতি করার সঙ্গে সঙ্গে বলা হয়েছে— রোগ আরোগ্য করার শক্তিও রয়েছে তাঁর মধ্যে (৬।৬১।৭)। এক্ষেত্রে তাঁকে বলা হয়েছে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পত্নী রোগ আরোগ্যকারিণী— অণমীবা ঈষ আ বৈহ্যস্মে (১০।১৭।৮)। সরস্বতীর রোগ নিরাময় শক্তির কথা আরও একটু বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে শুক্লযজুর্বেদে। সেখানে আছে— ইন্দ্র একবার তাঁর সমস্ত শক্তি হারিয়ে একটি ভেড়ার মতো হয়ে যান। সে সময় তাঁর চিকিৎসা করেন অশ্বিনীকুমাররা। এক্ষেত্রে শুশ্রূষাকারিণীর ভূমিকায় ছিলেন সরস্বতী। ইন্দ্র ছিলেন সংগীত নৃত্য প্রিয়। তাই নানাভাবে সেবা শুশ্রূষা করার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য-গীতের মাধ্যমে ইন্দ্রের মনে আনন্দের উদ্বোধন ঘটান তিনি। আর মানসিক স্বাস্থ্য ফিরে পাওয়ার কারণেই ইন্দ্রও হয়ে ওঠেন সুস্থ— অতি দ্রুত।

বেদে দেবী সরস্বতীর এই ধরনের মমতাময়ী, কলাবন্তী, জ্ঞানসাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞীর অভিজাত্যময়ী শান্ত রূপের সঙ্গে সঙ্গে বলা হয়েছে তাঁর রুদ্ররূপের কথাও। দেবী সরস্বতী কোনো সময়ই দেবতাদের নিন্দা সহ্য করতে পারতেন না— সরস্বতী দেবনিদো নিবর্হয় প্রজাং বিশ্বস্য বৃসয়স্য মায়িনঃ (৬।৬১।৩)। দেবনিন্দা শুনলেই উজ্জ্বলবর্ণা দেবী সরস্বতী শত্রুনাশিকা রথে আরোহণ করে এগিয়ে যেতেন দেববৈরী নিধনে। আর এভাবেই তিনি বধ করেন দেবনিন্দুক ত্বষ্টা পুত্রকে।

তিনি দেবী, নদীও

বেদের বহু জায়গা জুড়ে সরস্বতীর কথা থাকলেও সেখানে তিনি বিদ্যার দেবী নাকি নদী তা নিয়ে রয়েছে নানা বিতর্ক। বেদের ভাষ্যকার সায়নাচার্য এই বিতর্কের মীমাংসা করে বলেছেন, সরস্বতী একই সঙ্গে দেবী এবং নদীও। একইভাবে ঋগ্বেদে কথিত, দেবী বাক্ এবং সরস্বতী যে অভিন্ন একথাও বলেছেন বেদের বিভিন্ন ভাষ্যকার।

সুপ্রাচীন ভারতীয় ব্যাকরণবিদ ও ভাষাবিদ যাস্ক তাঁর নিরুক্ত ও নিঘণ্টু গ্রন্থে বেদের ভাষার অর্থ, প্রয়োগ এবং ভাষ্য সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন, আজও সেগুলিই বেদচর্চার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। যাস্ক তাঁর নিঘণ্টু গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বাক্‌দেবীর যে সাতান্নটি নামের উল্লেখ করেছেন তার অন্যতম হলো সরস্বতী। নিঘণ্টুকারের ব্যাখ্যা— বাক্ হলেন 'মাধ্যমিকা' দেবী। তিনি বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিরও অধিদেবতা এবং তিনিই নদী সরস্বতী। কেবল নদী নয়, ঋগ্বেদে তাঁকে বলা হয়েছে সকালের সূর্যেরই রূপ। অর্থাৎ তিনি রশ্মিবিকিরণকারী। বাস্তবে বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান তো নদীর মতো প্রবাহিত, রশ্মির মতোই বিকরিত।

তিনি প্রভাতরবির রশ্মি

কেবল নদী নন, বেদে সরস্বতী সম্পর্কে যে স্তুতি রয়েছে সেগুলি প্রকৃতপক্ষে সূর্য-বন্দনা। এমন কথাও বলেন কেউ কেউ। তাঁরা বলেন, সূর্যের সকালবেলার যে উজ্জ্বল অথচ শান্ত অনুত্তাপ রূপ, তারই নাম সরস্বতী। সূর্যের তেজ, তাপ জীবদেহে প্রবেশ করে চৈতন্যরূপে, তারই ফলে জাগ্রত হয় চেতনা, জ্ঞান এবং তারই প্রকৃত কর্ত্রী হলেন দেবী সরস্বতী।

যাস্ক তাঁর ব্যাখ্যায় দু-রকম সরস্বতীর কথা বলেছেন--- তত্র সরস্বতীত্যতস্য নদীবদ্দবতাবচ্চ নিগমা ভবন্তী। সরস্বতী কখনো ত্রিলোক-ভাসানো সূর্যের দীপ্তি। আবার কখনো দ্যাবাপৃথিবীতে বহমানা নদী।

এইসব ভাষ্য ও ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন, আর্য ঋষিরা বহতা নদীর স্রোতধারা এবং উদিত সূর্যের রশ্মিতে ক্রম উজ্জ্বল হয়ে ওঠা পৃথিবী এবং জীবজগতের জাগরণের মুহূর্তগুলিকে স্মরণ করেই রূপকার্থে দেবী সরস্বতীর ক্ষেত্রে

ওই উপমাগুলি আরোপ করেছেন। তাঁদের মতে, বিদ্যা ও জ্ঞান কখনোই এক জায়গায় থেমে থাকে না। স্রোতস্বিনীর মতোই তা বহমান। আবার জ্ঞান ও বিদ্যার দীপ্তিকেই মানুষের চোখের সামনে সৃষ্টির নব নব রূপগুলি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে অনেকটা প্রভাতসূর্যের আলোয় দৃশ্যমান জগতের মতো। প্রকৃতির এই দুই রূপেরই সম্মিলিত রূপ হিসেবে অধিষ্ঠান দেবী সরস্বতীর।

নাম ভিন্ন, রূপ এক

দুই বৈদিক দেবী— সরস্বতী ও বাক্। ঋগ্বেদে এই দুই দেবীর স্তুতিতেই আছে একাধিক সূক্ত। নামে দুই হলেও সে সময়ে এবং এখনও এই দুটি নামই একই দেবীর। সরস্বতীর রয়েছে যে নাম-সহস্রমালা তার একটি সুশোভিত কুসুম ওই বাগ্দেবী। বিদ্যা ও জ্ঞানের দেবী সরস্বতী। আর বাক্ হলেন বাকশক্তির মানসপ্রতিমা। তিনি হলেন কবি এবং স্বপ্নদর্শীদের বোধমূর্তি। তিনি তাঁর উপাসকদের দেন অভিব্যক্তি প্রকাশের স্বাভাবিক শক্তি। সরস্বতীর মতোই তিনিও 'বেদজননী'। তিনি সুরলোক-সম্রাজ্ঞী। সুমাধুর্যের দিব্যপ্রবাহ, সৃজন মননের মূর্ত বৈদিক প্রতীক। কেবল বেদে নয়, ঐতরেয় আরণ্যকেও ইন্দ্রের সঙ্গে একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে তাঁর নাম। পুরাণে অবশ্য বাগদেবী কাশ্যপ-জায়া।

সরস্বতী ও বাক্দেবী সম্পর্কে ঋগ্বেদে আলাদা আলাদা সূক্ত রচিত হলেও ভাষ্যকারদের সিদ্ধান্ত, নাম ভিন্ন হলেও এগুলির উদ্দীষ্টদেবী একজনই। সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণের (পঞ্চম অঙ্ক) সুস্পষ্ট ঘোষণা— বাগ্বৈ সরস্বতী বাচমেব তত প্রীণাতী। বাক্দেবীই যে সরস্বতী একথার প্রতিধ্বনি শোনা যায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রাহ্মণেও। কৃষ্ণ যজুর্বেদে বলা হয়েছে, বাগ্বৈ সরস্বতী তস্মাৎ প্রাণানাং বাগুত্তমা— বাক্-ই সরস্বতী, তাই তিনি প্রাণীগণের প্রিয়।

ঋগ্বেদে বেশ কয়েকটি সূক্তে বাক্দেবীর স্তুতি রয়েছে। দশম মণ্ডলের একটি সূক্তে (১২৫) বাক্দেবী নিজেকে রুদ্র, বসু, ইন্দ্র, অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অবলম্বন বলেছেন। বলেছেন, তিনিই সম্রাজ্ঞী, জ্ঞান। তিনি সকলকে ঈশ্বরমুখী করার প্রেরণা জোগান। একইভাবে প্রথম মণ্ডলেও (১৪২।৯) বলা হয়েছে। স্বর্গে রয়েছেন যে বাক্দেবী— নাম তাঁর ভারতী, পৃথিবীতে তিনি আছেন ইলারূপে আর অন্তরীক্ষে তিনিই হয়েছেন সরস্বতী। আর এইভাবেই বাগদেবী ও সরস্বতী মিলে মিশে এক হয়ে গেছেন সেই বেদের যুগেই।

ব্রহ্মার কন্যা

ঋগ্বেদের সরস্বতী সপ্তস্বসা বা সপ্তাবয়বা। তিনি জ্ঞানের দেবী--- জ্যোতিস্বরূপা। বেদে সরস্বতীর নানা গুণের কথা বলা হয়েছে বারবার। সব বললেও বেদে সরস্বতীর প্রতিমা অথবা মূর্তিরূপ সম্পর্কে তেমন স্পষ্ট কিছু বলা হয়নি। পরবর্তী বৈদিক গ্রন্থগুলিও সরস্বতীর উদ্ভব অথবা রূপ সম্পর্কে প্রায় নীরব। সরস্বতীর রূপকল্পে এবং আবির্ভাব সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যেতে থাকে পৌরাণিক যুগ থেকে। বিভিন্ন পুরাণ এবং রামায়ণ-মহাভারত মহাকাব্যগুলিতেই প্রথম সরস্বতীর দেবী রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়। বিভিন্ন পুরাণ মতে, সরস্বতীর স্রষ্টা ব্রহ্মা। অন্য কথায়, সরস্বতী হচ্ছেন ব্রহ্মার অঙ্গজা। ঠিক কীভাবে সরস্বতীর আবির্ভাব হয় সে সম্পর্কে পুরাণকাররা একমত নয়। সে কারণেই বিভিন্ন পুরাণে সরস্বতীর উদ্ভব সম্পর্কে রয়েছে নানা পরস্পর-বিরোধী তথ্য। এমনকী ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে তো বলা হয়েছে— সরস্বতীর জন্ম হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ থেকে। বলা হয়েছে, আবির্ভাবের পর কৃষ্ণরূপ মুক্তা সরস্বতী তাঁকেই পতি রূপে কামনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ অবশ্য স্রষ্টার সঙ্গে মিলনের অনৌচিত্যের কথা মনে করিয়ে দিয়ে তাঁকে বিষ্ণুর ঘরনি হওয়ার পরামর্শ দেন।

ব্রহ্মার থেকে সরস্বতীর উদ্ভবের কথাই বলা হয়েছে প্রায় প্রতিটি পুরাণে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের ৪৩ অধ্যায়ের কথা, সৃষ্টির আসনে বসার পর ব্রহ্মার হৃদয় উথাল-পাথাল সাত্ত্বিকতার উত্তাল তরঙ্গে। তাঁর হৃদয়ের সেই আলোড়িত অবস্থা থেকেই আবির্ভূতা হন সরস্বতী। শুভ্রবসনা জ্যোতির্ময়ী সেই দেবীকে দেখে ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করেন, কে তুমি? সরস্বতী বলেন, আমি আপনার মন থেকে জাত। এখন আপনিই বলুন, কী হবে আমার নাম? আমার বাসস্থানই-বা হবে কোথায়?

উত্তরে ব্রহ্মা বললেন, তোমার নাম সরস্বতী, জীবের জিহ্বাতে হবে তোমার আবাস। তুমিই নিয়ন্ত্রণ করবে সকলের বাক্শক্তিকে। তোমারই কৃপায় কবিরা রচনা করবেন কাব্য। আবার তুমিই বাধা হবে জীবের অশুভ বা অন্যায় প্রার্থনার পথে।

তাই হবে, বলে ব্রহ্মাকে প্রণাম করে সরস্বতী চলেন তাঁরই নির্দেশিত পথে। ত্রেতাযুগে দেববৈরী তিন ভাই রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ মহাশক্তি অর্জনের আশায় তপস্যায় বসেন। সরস্বতীই সেই সময় ব্রহ্মার নির্দেশে কুম্ভকর্ণকে 'নির্দেবত্ব' বরের পরিবর্তে 'নিদ্রাবত্ত্ব' চাওয়ান। তারই কথায় মহাবলী হওয়া সত্ত্বেও অকালে ঘুম ভেঙে রামের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয় কুম্ভকর্ণ।

কোনো কোনো পুরাণ মতে, সরস্বতীর উদ্ভব হয় ব্রহ্মার দেহ থেকে। অপরূপা কামময়ী শতরূপা নমের সেই কন্যাকে দেখে ব্রহ্মা হয়ে ওঠেন চঞ্চল। তাঁর সেই অচিন্ত্যনীয় অশোভন নয়নবাণ থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য যেদিকে সরে যান, সেদিকেই ব্রহ্মার একটি করে মুখ বেরিয়ে আসে। এইভাবে ব্রহ্মা চতুর্মুখ হয়ে উঠলে সরস্বতী উর্ধ্বলোকে উঠে যান। কিন্তু তখনও ব্রহ্মার মাথায় একটি মুখ দেখা দিলে নিরুপায় সরস্বতী আত্মসমর্পণে বাধ্য হন। তারই ফল স্বায়ম্ভুব মনু। কোনো কোনো পুরাণে অবশ্য বলা হয়, অবৈধ এই কামনার জন্য ব্রহ্মার পঞ্চম মুণ্ডটি উপড়ে ফেলেন দেবাদিদেব মহাদেব।

নদী হলেন তিনি

জ্ঞান-বিদ্যা- নানা কলার অধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মাপুত্রী সরস্বতীর নদী হয়ে ভূলোকে প্রবাহিত হওয়ার কাহিনি পরিবেশিত হয়েছে পদ্মপুরাণের সৃষ্টি থেকে। পুরাণ কাহিনি, একসময় ভার্গব এবং হেহয়দের মধ্যে মহা সংগ্রাম শুরু হলে ভার্গব ঋষি ঔর্ব এক জগৎধ্বংসী আগুনের সৃষ্টি খণ্ডে। বাড়ব

নামের সেই আগুন থেকে জগৎকে রক্ষা করার জন্য ইন্দ্রসহ অন্যান্যরা আসেন সরস্বতীর কাছে। জগৎকল্যাণে ওই আগুন পশ্চিম সাগরে ফেলার জন্য অনুরোধ জানান তাঁরা কিন্তু সরস্বতী বলেন, তিনি স্বাধীন নন। পিতা ব্রহ্মার অনুমতি ছাড়া তিনি কিছুই করতে পারবেন না।

অবস্থা বুঝে দেবতারা যান ব্রহ্মার কাছে। সব শুনে সরস্বতীকে দেববাঞ্ছিত ওই কাজটি করার নির্দেশ দেন ব্রহ্মা। সজল চোখে স্বর্গ ছেড়ে নদীরূপে মর্ত্যে অবতীর্ণ হন সরস্বতী। তাঁকে অনুসরণ করেন গঙ্গা, যমুনা, মনোরমা, গায়ত্রী ও সাবিত্রী। একসময় স্রোতস্বিনী সরস্বতী এসে পৌঁছান পুষ্করে ঋষি উতঙ্গের আশ্রমে। সেইখানে ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে শিব সেই অগ্নিভাণ্ড তুলে দেন সরস্বতীর হাতে। এর আগেই সরস্বতী পেয়েছিলেন অগ্নির বর। তাই জ্বলন্ত অগ্নিভাণ্ডতে কোনো ক্ষতিই হয় না সরস্বতীর। লোকপাপ হরণে সরস্বতী পুষ্কর হ্রদে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে নিষ্কলুষ হওয়ার কামনায় মানুষ এখনও স্নান করেন ওখানে। বিশ্বাস, এখানে স্নান করে সকলে স্থান পাবেন ব্রহ্মলোকে।

পুষ্কর থেকে পশ্চিমবাহিনী হয়ে সরস্বতী পুষ্করের অদূরে এক খেজুর বাগানে আবার উত্থিত হন। এবার নামহয় তাঁর নন্দা। এই নামকরণের পেছনে রয়েছে অবশ্য আরেক কাহিনি।

নন্দা হলেন তিনি

তিনি এক রাজা। নাম প্রভঞ্জন। সেদিন গেছেন মৃগয়ায়। ঘুরতে ঘুরতে ঝোপের আড়ালে এক হরিণীকে দেখে তির ছোঁড়েন তিনি। শরবিদ্ধ হরিণী চিৎকার করে বলে ওঠে, হায় রে! এ কেমন রাজা! আমি জানতাম রাজারা কখনো জলপানরত, সঙ্গমরত অথবা শাবককে স্তন্যদানরত হরিণীকে হত্যা করেন না। কিন্তু এ রাজা তো দেখছি শার্দূলের মতো নির্দয়। বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছি দেখেও এ বধ করল আমাকে। এই অন্যায়ের জন্য রাজা আপনাকে অভিশাপ দিচ্ছি— আপনি বাঘ হয়ে ঘুরবেন এই বনে।

রাজা প্রভঞ্জন এতক্ষণে বোঝেন ব্যাপারটা। হরিণী যে বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছিল এটা তিনি দেখেননি। তাই করে বসলেন এই অনৈতিক কাজটি। এখন অভিশপ্ত হয়ে রাজা বারবার ক্ষমা চান হরিণীর কাছে। অনুরোধ করেন, ভয়ানক ওই অভিশাপটি তুলে নেওয়ার জন্য।

রাজার কান্নাকাটিতে মন গলে হরিণীর। বলে, একশো বছর পরে নন্দা নামে একটি গাভীর সঙ্গে দেখা হবে রাজার। তার সঙ্গে কথা বলামাত্রই শাপমুক্ত হবেন রাজা। মারা যায় হরিণী। রাজাও বাঘে রূপান্তরিত হয়ে বিচরণ করতে থাকেন জঙ্গলে।

কেটে যায় একশো বছর। বাঘ-রাজ তখন নদীর তীরে রোহিত পাহাড়ের জঙ্গলে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। ওইরকম একটা সময় নন্দা নামে এক গাভীর নেতৃত্বে একপাল গোরু আসে ওই বনে খাবারের সন্ধানে। দলছুট হয়ে বেশ খানিকটা দূরে নন্দা চিবুচ্ছে ঘাস। এমন সময় হাজির ওই বাঘ। তাকে দেখে ভয় পায় না নন্দা। কেবল অনুরোধ করে, এখুনি মেরো না আমায়। অভুক্ত রয়েছে আমার বাচ্চা। কথা দিচ্ছি, তাকে খাইয়েই ফিরে আসবো এখানে। তখন আমায় মেরে মিটিও তোমার খিদে।

কী ভেবে বাঘ-রাজা রাজি হয়ে যায়। চলে যায় নন্দা। বাঘ জানে, আসবে না ও আর। কিন্তু অবাক কাণ্ড! বহুক্ষণ পরে ফিরে আসে নন্দা। বলে, এবার আমায় খেয়ে মেটাও তোমার খিদে।

বাঘ-রাজা অবাক। এমনটাও হয়! মৃত্যু জেনেও কেউ ফিরে আসে এভাবে কথা রাখতে! তাই সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা, কে তুমি? কী নাম তোমার?

— এক পাল গাভীর নেত্রী আমি। নাম আমার নন্দা।

—-নন্দা! নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে শাপমুক্তি। রাজা এবার সশরীরে, পূর্বরূপে। নন্দার সততায় মুক্ত স্বয়ং ধর্মও। আবির্ভূত হন তিনি সেখানে। নন্দাকে বর দিতে চান তিনি। বলেন, জানাও তোমার প্রার্থনা।

নন্দা বলে, শাবক-সহ আমি যেন পাই পরমস্থান। এ জায়গাটা হোক মুনিদের তপোবন। আর এই নদী হোক সরস্বতী, তবে লোকে যেন তাকে ডাকে আমারই নামে— নন্দা নদী বলে।

নন্দা পূর্ণকাম। সেই মুহূর্তে স্বর্গে হয় তার স্থান। প্রভঞ্জন ফিরে যান নিজ রাজ্যে। আর সেদিন থেকেই নদীর নাম হয় নন্দা। সরস্বতীও এখান থেকে দক্ষিণে কিছুটা প্রবাহিত হয়ে আবার উত্তরবাহিনী। অবশেষে সাগর। সেখানেই রাখেন সেই বাড়বাগ্নির পাত্রটি।

দেবী সরস্বতীর নদী হওয়ার এক পৌরাণিক কাহিনি। পদ্মপুরাণের মতোই গরুড় পুরাণেও রয়েছে সরস্বতী-কথা। সেখানে বলা হয়েছে, সরস্বতী অষ্ট-শক্তির অধিকারী। সেই আটশক্তি হলো— শ্রদ্ধা, ঋদ্ধি, কলা, মেধা, পুষ্টি, প্রভা, মতি ও ধৃতি।

শঙ্করাচার্য অবশ্য সরস্বতীর ন'টি শক্তির কথা বলেছেন। সেগুলি হলো— মেধা, প্রভা, বিদ্যা, ধী, ধৃতি, স্মৃতি, বুদ্ধয়ঃ/ বিদ্যেশ্বরীতি সংপ্রোক্তা ভারত্যাঃ নবশাক্তয়ঃ। প্রসঙ্গত, সরস্বতীর এই যেসব বিশেষ শক্তির কথা বলা হয়েছে, তার সবগুলিই কিন্তু শ্রীশ্রীচণ্ডীর। বিষ্ণুমায়াস্তুতি'তে খুঁজে পাওয়া যাবে।

দেবী দুর্গার মতোই সরস্বতীরও রয়েছে নানা মূর্তি। তার মধ্যে প্রসিদ্ধ অষ্টমূর্তি হলো— লক্ষ্মীর্মেধা ধরাপুষ্টিঃ গৌরী তুষ্টিঃ প্রভাধৃতিঃ।/ এতাভিঃ পাহি তনুভিঃ অষ্টাভির্মাং সরস্বতী।

বিশেষ পণ্ডিতরা মনে করেন, দেবী সরস্বতী আদ্যাশক্তির প্রতীক আর তাই তাঁর মূর্তি, গুণ, শক্তি ইত্যাদি সবই দুর্গা, লক্ষ্মী ইত্যাদির সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে গেছে।

তিনি দেবী সকলের

বেদ-পুরাণের দেবী সরস্বতী আজ কেবল হিন্দুরই আরাধ্যা নন, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ইত্যাদি সব মত-পথের মানুষই বন্দনা করেন জ্ঞানের দেবী সরস্বতীর। তাই-বা কেন, বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই নানা রূপে নানা নামে পূজিতা হয়ে আসছেন প্রজ্ঞার দেবী সরস্বতী। বস্তুত, যেখানে হয় জ্ঞানচর্চা সেখানেই অবস্থান দেবী সরস্বতীর। সেদিন থেকে আলো-হাওয়ার মতোই তাঁর স্থিতি বিশ্বজুড়ে।

মহাবিদ্যা সরস্বতী

গোপাল চক্রবর্তী

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের তৃতীয় অধ্যায়ের সৃষ্টি নিরুপণ পর্যায়ে মহাবিদ্যা সরস্বতী আবির্ভাবের কথা বর্ণিত হয়েছে। আদি বায়ুশূন্য, প্রাণীশূন্য, শস্যবিহীন, পাহাড়-পর্বত ও সাগরশূন্য, গোলককে প্রত্যক্ষ করে ভগবান নিজের ইচ্ছাতে সৃষ্টির সূচনা করেন। প্রথমে তিনি তাঁর ডান দিক থেকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ--- এই তিন গুণের আবির্ভাব ঘটালেন। তারপর নারায়ণ, মহাদেব, ব্রহ্মা, ধর্ম প্রমুখ দেবতার আবির্ভাব ঘটল। ধর্মের বাম দিক থেকে উঠে এলেন পদ্মাসনা লক্ষ্মীর ন্যায় এক কন্যা মূর্তি। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মুখ থেকে এক দেবীর সৃষ্টি করলেন। তিনি হলেন সরস্বতী। তিনি বীণা ও পুস্তকধারিণী, শুভ্রগাত্রবর্ণা দেবী চন্দ্রের মতো সুষমামণ্ডিত। তাঁর আঁখিপল্লব যেন দুটি পদ্ম। তিনি আগুনরঙা পট্টবস্ত্রে সুসজ্জিত। বিভিন্ন অলংকার ও রত্নরাজিতে সুশোভিতা। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী নারী। শ্রুতি ও শাস্ত্রে সকলের শ্রেষ্ঠা। তিনি জ্ঞানীদের কাছে উত্তম মাতা হিসাবে বিরাজিতা। তিনি জগদ্ধাত্রী, তিনি শুদ্ধশাস্ত্রময়ী, শাস্ত্র স্বরূপা। কবিগণ তাঁকে ইষ্টদেবীরূপে বন্দনা করে থাকেন।

বীণাধারিণী সরস্বতী শ্রীকৃষ্ণের সামনে হাতজোড় করে দাঁড়ালেন। শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে তিনি সুখলাভ করেন। তিনি বীণাবাদ্য সহকারে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতিগান করেন, নৃত্য প্রদর্শন করেন। তাঁর নৃত্য গীতের মধ্য দিয়ে যুগে যুগে শ্রীহরির ক্রিয়াকলাপের প্রকাশ ঘটে। তিনি শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করলেন এভাবে— 'আপন রাসমণ্ডলে অবস্থানকারী, রত্নসিংহাসনে আরূঢ়, রত্নভূষণে শোভিত, আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ, আপনি রাসেশ্বরী শ্রীরাধার সঙ্গী, আপনি রাসবিহারী, আপনার চরণে প্রণিপাত জানাই। আপনি প্রতিটি রাসে বিহারকারী রাসোৎসুক, গোপীগণের পরমকান্ত, প্রিয়তম আপনি সকলের মনোহরণকারী, হে কৃষ্ণ! আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

দেবী সরস্বতী তাঁর কৃষ্ণস্তুতি শেষ করে হাস্যমুখে সকলের সঙ্গে আলাপন সারলেন। তারপর রত্ন সিংহাসনে বসলেন। দেবী সরস্বতীর মুখনিঃসৃত এই স্তোত্র যে প্রত্যহ ভোরে পাঠ করে সে ধনবান হয়। সে বিদ্যা ও পুত্র লাভ করে। তার দুর্বুদ্ধি নাশ হয়ে সুবুদ্ধির উদয় হয়।

পুরাণ ছাড়াও বেদে দেবী সরস্বতীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের তৃতীয় সুক্তটির শেষ তিনটি মন্ত্রের দেবতা সরস্বতী। এই মন্ত্রগুলির দ্বারা সরস্বতীর স্তুতি করা হয়েছে। নিঘণ্টুতে সরস্বতী পদটি নদীবাচক, বাক্-বাচক ও দেবতাবাচক শব্দের সূচিতে পাওয়া যায়। আচার্য যাস্ক সরস্বতী সম্বন্ধে বলেছেন, 'তত্র সরস্বতীত্যেতস্য নদীবদ্ দেবতা বচ্চ নিগনা ভবন্তি' (নিরুক্ত ১।২৩)। নদীরূপা সরস্বতী বেগবতী, সমুদ্রগামিনী। পর্বতের সানুদেশ বা পর্বতশৃঙ্গ ঊর্মিসমূহের দ্বারা সবেগে ভগ্ন করে প্রবাহিত হয় সরস্বতী নদী। এই নদী প্রবাহকালে দুই কূল প্লাবিত করে ও ভগ্ন করে। সব নদীর মধ্যে সরস্বতী শ্রেষ্ঠ। তাই তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে, অম্বিতমে, নদীতমে, দেবীতমে বলে। যাস্কাচার্য সরস্বতী শব্দের নির্বাচন করে বলেছেন, 'সরস্বতী সর ইত্যুদঝানাম্ সর্ত্তেস্তদ্বতী' (৯।২৬)। সরস্বতী শব্দের অর্থ গতিময় জলধারা। সরস্বতীর জল অশ্বমেধ, রাজসূয় প্রভৃতি যজ্ঞে প্রয়োজন হতো।

বিগ্রহবতী সরস্বতী নৈরুক্তদের মতে মাধ্যমিকা বাক্। তিনি অন্তরিক্ষ থেকে বর্ষণকর্ম সাধন করেন, তাই তিনি বাজিনীবতী বা অন্নবতী। অপরপক্ষে তিনি শোধায়ত্রী, সুন্দর ও প্রিয়বাক্য প্রেরণ করেন, শোভন বুদ্ধির প্রকাশ করেন। কয়েকটি বিক্ষিপ্ত মন্ত্রে এইভাবে বাগাধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপেও সরস্বতীর স্তুতি পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যের পরবর্তী পর্যায়ে সরস্বতীকে বাক্ রূপে উপস্থাপিত করে বলা হয়েছে 'বাগ্‌-বৈ-সরস্বতী।

ঋগ্বেদের বহু মন্ত্রে ভারতী, ইলা ও সরস্বতী এই তিন দেবীর সহস্তুতি পাওয়া যায়। নির্ঘণ্টুর দৈবাত কাণ্ডে 'তিস্ত্রো দেবী' নামে এই তিনজনকেই নির্দেশ করা হয়েছে।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের তৃতীয় সুক্তে যে মন্ত্রগুলিতে সরস্বতীর স্তুতি করা হয়েছে তার ভাবার্থ হলো— সরস্বতী জলবর্ষণের দ্বারা অন্ন উৎপাদনে সহায়তা করেন তাই তিনি বাজিনীবতী বা অন্নবতী। 'বাজ' শব্দের অর্থ অন্ন। তিনি 'ধিয়া বসুঃ' 'ধি' শব্দের অর্থ বুদ্ধি বা কর্ম। সরস্বতী বুদ্ধি ও কর্মের দ্বারা ধনপ্রাপ্তিতে সহায়তা করেন। এখানে যেন বাগ্‌দেবী সরস্বতীর আভাস পাওয়া যায়। ঐতরেয় আরণ্যকে স্পষ্টতই বলা হয়েছে, 'বাগবৈধিয়াবসুঃ' (১।১।৪), আচার্য সায়ণ সেখানে শব্দটির বুদ্ধিপ্রদা অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। সরস্বতী প্রিয় ও সত্যবাক্য বলতে প্রেরণা দেন। শুভ বুদ্ধি ও শুভ চেতনাকে উদ্বোধিত করেন এবং সেই সঙ্গে যজ্ঞও ধারণ করেন। নদীরূপা সরস্বতী প্রবল বেগে বহমানা, তার সবেগ গতিময়তার মধ্য দিয়ে বিপুল জলরাশি প্রকাশিত হচ্ছে। অপরপক্ষে বিগ্রহবতী সরস্বতী বুদ্ধিকে, প্রজ্ঞানকে আলোকিত করেছেন। সায়নাচার্যের মতে এই বুদ্ধি অনুষ্ঠান বিষয়ক। □

ফঃ৫

বিবেকানন্দ পাঠচক্রের পাঁচদিন ব্যাপী স্বামী বিবেকানন্দ মিলন মেলা

স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে উত্তর কলকাতা কালী সিংহী পার্ক ও সিমলা ব্যায়াম সমিতি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় পাঁচদিন ব্যাপী স্বামী বিবেকানন্দ মিলন মেলা। ১০ থেকে ১৪ জানুয়ারি স্বামী শিবময়ানন্দ মঞ্চে স্বামী বিবেকানন্দ মিলন মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সহযোগিতায় ছিল সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ।

১০ জানুয়ারি বিকাল ৫টা ৩০ মিনিটে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও দীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে মেলার শুভ সূচনা হয়। উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহ সঙ্ঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গিরীশানন্দ, বিবেকানন্দ পাঠচক্রের সভাপতি কর্নেল সব্যসাচী বাগচী, আইনজীবী অনিন্দ্য কুমার মিত্র প্রমুখ। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সম্পাদক স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ।

স্বামী গিরীশানন্দ বলেন, স্বামীজীর আদর্শ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেই এই মেলার আয়োজন। কর্নেল বাগচী স্বাগত ভাষণে বলেন, স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে উত্তর কলকাতার কয়েকজন যুবক সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান রূপে বিবেকানন্দ পাঠচক্র প্রতিষ্ঠা করেন, যা আজকে বহুমুখী কর্মযোজনার মাধ্যমে মহীরূহে পরিণত হয়েছে। পাঠচক্রের সম্পাদক সুদীপ দত্ত বলেন, সকলস্তরের মানুষকে এক ছত্রতলে আনার মহতী উদ্যোগ এই মিলন মেলা। সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের কার্যকরী সভাপতি ও পাঠচক্রের অন্যতম সহ সভাপতি সুভাষ ভট্টাচার্য্য বলেন, ১৯৭০ সাল থেকে স্বামীজীর জন্মোৎসব নিষ্ঠাসহকারে পালন করার পাশাপাশি বিগত ১৫ বছর ধরে এই মেলার আয়োজন আজ প্রকৃতই মিলন মেলার রূপ নিয়েছে।

উদ্বোধনী পর্বের সূচনাতে বৃন্দগান পরিবেশন করেন অনিমা দাস মজুমদারের পরিচালনায় উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গোবরডাঙা মুকুলিকা সংগীত বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। শাস্ত্রীয় সংগীতানুষ্ঠানে পাখোয়াজ বাদন করেন অভিজিৎ ব্যানার্জি, হারমোনিয়ামে কেয়া ব্যানার্জি, তবলাতে ধীমান ভট্টাচার্য এবং কণ্ঠসংগীতে সাগ্নিক ভট্টাচার্য। সন্তুর বাদন করেন পণ্ডিত তরুণ ভট্টাচার্য এবং তবলায় সঙ্গত করেন জ্যোতির্ময় রায়চৌধুরী।

১১ জানুয়ারি সকাল ১০ টায় অনুষ্ঠিত হয় যুব সম্মেলন। প্রধান অতিথি রূপে বক্তব্য রাখেন স্বামী বেদনিষ্ঠানন্দ এবং সুপ্রতীপ চক্রবর্তী। দুপুর আড়াইটা নাগাদ অনুষ্ঠিত হয় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয় হেনা দত্তের পরিচালনায় বিবেকানন্দ পাঠচক্রের সদস্যদের সমবেত গানের মধ্য দিয়ে। এর পরে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় 'স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে 'এবার কেন্দ্র বিবেকানন্দ' বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন রহড়া বিবেকানন্দ সেন্টিনারি কলেজের অধ্যক্ষ স্বামী কমলাস্থানন্দ, অধ্যাপক তথাগত রায়, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকার, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিস-এর অধিকর্তা তথা সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি ড. সরূপপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ। এরপর ট্র্যাডিশনাল লাটি স্পোর্টস অ্যাসোশিয়েশন অব নর্থ কলকাতার প্রশিক্ষক শ্রীজিৎ পাল ও লাওসি অরূপ চক্রবর্তীর পরিচালনায় লাঠিখেলা এবং সিমলা ব্যায়াম সমিতি কর্তৃক যোগাসন প্রদর্শিত হয়।

১২ জানুয়ারি সকালে স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের আয়োজনে এবং বিবেকানন্দ পাঠচক্রের সহযোগিতায় একটি পদযাত্রা রাজপথ পরিক্রমা করে স্বামীজীর বাড়িতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে। সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে ৫-৩০ মিনিটে

তনুশ্রী মল্লিকের পরিচালনায় পরিবেশিত হয় সংস্কার ভারতী হাওড়া জেলার সদস্যদের সংগীত আলেখ্য 'প্রণমি ভারত অরিন্দম'। প্রধান অতিথি ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ কথামৃত ভবনের অধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধেশানন্দ। সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পাঠচক্রের সহ সভাপতি সুভাষ ভট্টাচার্য। শাস্ত্রীয় সংগীতানুষ্ঠান পরিবেশন করেন মন্দিরা লাহিড়ী, হারমোনিয়ামে সঙ্গত করেন পণ্ডিত সনাতন গোস্বামী ও তবলায় সঙ্গত করেন রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য। তবলা লহড়া পরিবেশন করেন অর্কদীপ দাস ও নবাগত ভট্টাচার্য। বাঁশি বাদন করেন অশোক কর্মকার এবং তবলায় সঙ্গত করেন মনোজ পাণ্ডে।

১৩ জানুয়ারি সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে সংস্কার ভারতী উত্তর কলকাতা জেলার পরিবেশনায় সবিতা দত্তের পরিচালনায় সংগীতালেখ্য 'স্মরণে বরণে স্বামীজী'। 'অমিয় কুমার মজুমদার স্মারক বক্তৃতা'য় বক্তব্য রাখেন শক্তিপ্রসাদ মিশ্র (নিবেদিতা অধ্যাপক, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক)। সভামুখ্য ছিলেন অধ্যাপিকা রাইকমল দাশগুপ্ত। পরবর্তীতে কীর্তন পরিবেশন করেন নির্মলা ভট্টাচার্য এবং স্বামীজীর প্রিয় গান পরিবেশন করেন সঙ্গীতা দত্ত। শেষে ছিল অমিত দে রচিত ও পরিচালিত দ্য বয়েজ ওন শিশু নাট্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিল্পীদের নাটক 'যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ'।

১৪ জানুয়ারি শেষদিনের সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয় ব্যায়াম সমিতি সঙ্গীতগোষ্ঠীর সমবেত সংগীতের মধ্য দিয়ে। সভাপর্বে পৌরোহিত্য করেন সংস্কার ভারতী কেন্দ্রীয় সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায়। তিনি বলেন, ঠাকুর-মা-স্বামীজী-নিবেদিতার মতো পথ প্রদর্শকের বাণী অনুধাবন করে আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়ে আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে হবে। শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের প্রব্রাজিকা আত্মদীপপ্রাণা মাতাজী বলেন, সমাজের উন্নতির জন্য নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যোগ,ধ্যান অনুশীলনের মধ্য দিয়ে সার্বিক আত্মজাগরণের প্রয়োজন। এরপর সংস্কার ভারতী দক্ষিণ কলকাতা জেলার সংগীতগোষ্ঠী রুমা মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'বিবেকানন্দ ও তাঁর স্বদেশচেতনা' শীর্ষক সংগীতাঞ্জলি পরিবেশন করেন।

ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী ধ্রুবজিৎ ভট্টাচার্য। সবশেষে রাজা রামমোহন রায় ইনসটিটিউট অব কালচারাল স্টাডিজের সৃজনী কলাকেন্দ্রের দেবদীপ রায়ের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় সংগীত-নৃত্যাঞ্জলি।

পাঁচদিনব্যাপী স্বামী বিবেকানন্দ মিলন মেলায় ছিল পুস্তক, হস্তশিল্প, খাদ্য ও অন্যান্য বিপণী।

বিবেকানন্দ কেন্দ্রের দ্বারা স্বামীজীর জন্মতিথি উদ্‌যাপন

গত ২১ জানুয়ারি বিবেকানন্দ কেন্দ্র, কন্যাকুমারীর উদ্যোগে স্বামীজীর পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে স্বামী বিবেকানন্দ মঞ্চে স্বামীজীর জন্মতিথি পালন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই শান্তিমন্ত্র পাঠ করেন বিবেকানন্দ কেন্দ্রের ড. কথাকলি ভট্টাচার্য। এরপর অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা অধ্যাপক ড. রাকেশ দাস ও বিবেকানন্দ কেন্দ্রের একনাথ বিভাগের সঞ্চালক দেবাশিস লাহিড়ীকে বরণ করে নেন সংস্থার কার্যকর্তা বিশ্বাস লাপালকর ও তরুণ জানা।

পরিচয়াত্মক বক্তব্য রাখেন একনাথ বিভাগ প্রমুখ তরুণ জানা। স্বদেশমন্ত্র পাঠ করে অর্পিতা বর্ধন। এর পরেই বরণ করে নেওয়া হয় বিভিন্ন বিদ্যালয়ে

অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার বিচারকদের। মৌমিতা দাস সরকার স্বামীজীর উপর রচিত সংস্কৃত গান 'ভুবন মণ্ডলে নবযুগমুদয়তু' পরিবেশন করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ড. রাকেশ দাস প্রকৃত বন্ধু ও পথপ্রদর্শক রূপে সর্বকালের জন্য আদর্শ চরিত্ররূপে স্বামীজীর ভূমিকা ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করে গল্পের আকারে মনোজ্ঞ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। বক্তব্যের পরেই বিভিন্ন বিবাগে স্থানাধিকারীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। স্বামীজীর জন্মতিথিকে উপলক্ষ্য করে কলকাতার ৬টি বিদ্যালয়ের ২টি অঙ্কন বিদ্যালয়ের সহযোগিতায় আবৃত্তি, অঙ্কন ও দেশভক্তি গানের প্রতিযোগিতা হয়। তাতে মোট ১৫৬ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুস্তক ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়। সভাগারের বাইরে ছাত্র-ছাত্রীদের আঁকা ছবিগুলি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বাংলা প্রকাশনা বিভাগের সহ প্রমুখ শম্পা দাস। একনাথ বিভাগ টোলির সদস্য শ্যামসুন্দর জয়সোয়ালের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর রাষ্ট্রগীত 'বন্দেমাতরম' গাওয়া হয়। শান্তিমন্ত্র পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

স্বস্তিকার সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকাকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।
—জনৈক শুভানুধ্যায়ী

সিউড়ীতে নিঃশুল্ক চক্ষু পরীক্ষা শিবির

গত ১৯ জানুয়ারি সিউড়ী শহরে অরবিন্দ পল্লী সরস্বতী শিশু মন্দিরের সেবা বিভাগ দ্বারা নিঃশুল্ক চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে আয়োজন করা হয়। ১৫১ জন চক্ষু রোগীর চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। তাদের মধ্যে ৯০ জনকে চিহ্নিত করা হয় চক্ষু অপারেশনের জন্য। পরবর্তীতে কয়েক বারে তাদের পুরুলিয়া রামচন্দ্রপুর নেতাজী চক্ষু হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চক্ষু অপারেশন ও লেন্স বসানো হবে। এক মাসের ওষুধপত্র দিয়ে পুনরায় সিউড়িতে পৌঁছে দেওয়া এবং তারপর তাদের বিনামূল্যে চশমা প্রদান করা হবে।

শিবিরে পুরুলিয়া নেতাজী চক্ষু হাসপাতাল থেকে দু'জন ডাক্তার এবং চারজন সহকর্মী এসেছিলেন। বীরভূম সেবা ট্রাস্ট এবং শিশু মন্দির সেবা বিভাগ এই নিয়ে চারবার চক্ষু পরীক্ষা শিবির আয়োজন করেছে। শিবির পরিচালনা করেন ট্রাস্টের সভাপতি এবং শিশু মন্দিরের কোষাধ্যক্ষ দেবব্রত মহন্ত।

উপস্থিত ছিলেন শিশু মন্দিরের সভাপতি সুনীল কুমার বিষ্ণু, সহ সভাপতি স্বপন কুমার চক্রবর্তী, প্রধান আচার্য নির্মল ঠাকুর, সহ প্রধান আচার্য অরবিন্দ চৌধুরী-সহ অন্যান্য আচার্য, সহায়ক-সহায়িকা।

বসিরহাটে বিবেক আলোয় সুভাষ মনন

গত ১৯ জানুয়ারি সন্ন্যাসী দেশনায়ক-ফোরাম ফর সোশ্যাল চেঞ্জ, বসিরহাটের উদ্যোগে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট টাউনহলে আয়োজিত হয় 'বিবেক আলোয় সুভাষ মনন'-শীর্ষক একটি আলোচনাসভা এবং তথ্যচিত্র প্রদর্শনী। এই মহতী সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী স্বামী তৎপরানন্দজী মহারাজ। সভায় সভাপতিত্ব করেন চন্দ্রকেতুগড় শহীদুল্লাহ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. নারায়ণ দাশ। সভায় অংশগ্রহণকারীদের সামনে পূজনীয় মহারাজ তুলে ধরেন স্বামীজীর আদর্শ। স্বামীজীর চিন্তাধারার বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে কীভাবে সেই জীবনাদর্শ দেশনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনে প্রতিফলিত ও প্রতিভাত হয়েছে তার অসংখ্য উদাহরণ উপস্থাপন করেন মহারাজ। আগামী প্রজন্মকে স্বামীজী ও নেতাজীর আদর্শে পরিচালিত হওয়ার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেন তিনি। মহারাজের বক্তব্য সকলের মন ছুঁয়ে যায়। এরপর বক্তব্য রাখেন আর প্লাস চ্যানেলের সম্পাদক, বিশিষ্ট সাংবাদিক ড. ঋতব্রত ভট্টাচার্য। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে স্বামীজীর ভাবনাচিন্তার প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টি তুলে ধরেন। এরপর তাঁর পরিচালিত তথ্যচিত্র 'স্বামী বিবেকানন্দ— দ্য কনডেন্সড্ ইন্ডিয়া (ভারতআত্মার মূর্ত প্রতীক)'- সম্পর্কে সংক্ষেপে বলেন চলচ্চিত্র পরিচালক অম্লানকুসুম ঘোষ। এরপর সভাঘরে তথ্যচিত্রটি প্রদর্শিত হয়। সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

উত্তর ২৪ পরগনা স্বামী বিবেকানন্দ সেবা ট্রাস্টের উদ্যোগে শিশু বিদ্যামন্দিরের শুভারম্ভ

উত্তর ২৪ পরগনা স্বামী বিবেকানন্দ সেবা ট্রাস্টের উদ্যোগে বনগাঁ পেট্রাপোল হরিদাসপুরের পঞ্চাননতলায় শুভারম্ভ হলো রঞ্জন দেবনাথ স্মৃতি সরস্বতী শিশু বিদ্যামন্দিরের। এই উপলক্ষ্যে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ৮৫ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিতে শিক্ষাদান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে এবং বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দি ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষা দেওয়া বলে জানান সেবা ট্রাস্টের কার্যকর্তা। আবাসিক ও অনাবাসিক দুটি ব্যবস্থায় থাকবে। পঠনপাঠনের পাশাপাশি থাকছে ডক্টর সুময় হীরা স্কিল ডেভলপমেন্ট সেন্টার।

জাতীয় গ্রন্থাগারে লোকপ্রজ্ঞার ১৯ তম অনুভব দর্শন অনুষ্ঠান

গত ১৯ জানুয়ারি জাতীয় গ্রন্থাগার এবং অখিল ভারতীয় প্রবুদ্ধ মঞ্চ প্রজ্ঞা প্রবাহের পশ্চিমবঙ্গের সংগঠন লোকপ্রজ্ঞার যৌথ উদ্যোগে 'স্বামীজী ও নেতাজীর বর্তমান যুব সমাজে প্রসঙ্গিকতা' বিষয়ে আয়োজিত হয় অনুভব দর্শন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ড. সিভি আনন্দ বোস।

রাষ্ট্রবোধ নিয়ে হওয়া এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয় বেলুড় মঠের রেজিস্ট্রার স্বামী ক্লেশানন্দ মহারাজ, প্রজ্ঞা প্রবাহের অখিল ভারতীয় যুব প্রমুখ ঈশান জোশী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিকল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. সোমনাথ ভট্টাচার্য, বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ডিন ড. সোমশুভ্র গুপ্ত, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক দিলীপ কুমার মিশ্র। সার্বিক ব্যবস্থায় ছিলেন লোক প্রজ্ঞার রাজ্য গবেষণা প্রমুখ ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার, রাজ্য সম্পর্ক প্রমুখ আশিস মণ্ডল প্রমুখ। সম্মেলনে ২৭০ জন ছাত্রছাত্রী-সহ ৫০০ জন অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় গ্রন্থাগারের মহানির্দেশক অধ্যাপক অজয় প্রতাপ সিংহের উপস্থিতিতে এবং সহায়তায় সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হয় ১৯ তম অনুভব দর্শন অনুষ্ঠান।

কলিগ্রামে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

গত ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩ জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করল উত্তর মালদহের চাঁচল সংলগ্ন কলিগ্রামের 'স্বামী বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন সমিতি'। এদিন সকালে প্রভাতফেরির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এরপর একে একে উদ্বোধনী সংগীত, স্বামীজীর মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য প্রদান, দুঃস্থদের শীতবস্ত্র ও কম্বল বিতরণ, রক্তদান শিবির এবং বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিগত চার দশক ধরে স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই সমিতি সেবাকাজ করে চলেছে। সুভাষকৃষ্ণ গোস্বামী, মোহিতলাল গোস্বামী-সহ এলাকার বহু সমাজসেবী মানুষ এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন চাঁচলের বিশিষ্ট সমাজসেবী দীপক চট্টোপাধ্যায়।

ত্রিপুরায় সঙ্ঘের নগর উৎসব উদ্‌যাপিত

গত ১২ জানুয়ারি,আগরতলা শহরে হয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, ত্রিপুরা প্রান্ত আয়োজিত 'নগর উৎসব'। বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এদিন উদ্‌যাপিত হয় নগর উৎসব। সঙ্ঘের ত্রিপুরা প্রান্তের যোজনা অনুযায়ী আগরতলা শহরের স্বামী বিবেকানন্দ মাঠে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট হিসাববিদ (চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট) অজয়কান্তি পাল এবং মুখ্য বক্তা ছিলেন অসম ক্ষেত্র প্রচারক

বশিষ্ঠ বুজর বড়ুয়া। উৎসবে বিপুল সংখ্যক স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন। উৎসবে রাষ্ট্র ও সমাজ কল্যাণে নাগরিক কর্তব্যের উপর বিশদ আলোচনা করা হয়।

উৎসবে উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা হিন্দুসমাজকে একত্রিত হয়ে, সম্মিলিতভাবে আগামীদিনে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। হিন্দুত্বের আদর্শে দেশ গড়ার জন্য উৎসবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

চিত্রাঙ্গর কথা

এক গ্রামে অনেক কুকুর বাস করত। তারা সারাদিন পথে পথে ঘুরত আর যেখানে যা পেত তাই খেয়ে পেট ভরাত। ওদের কোনো থাকার জায়গা ছিল না।

একবার সেই রাজ্যে এল দারুণ দুর্ভিক্ষ। গ্রামের মাঠে ফসল নেই। মানুষের ঘরে খাবার নেই। কত মানুষ না খেতে পেয়ে মারা গেল। মাঠে ঘাস নেই। গোরু-ছাগল সব না খেতে পেয়ে মারা গেল। আর কুকুরগুলোর কী যে দশা! কোনো বাড়ি থেকেই তারা একদানা খাবারও পায় না।

এই অবস্থায় চিত্রাঙ্গ নামে এক কুকুর তার সঙ্গীদের কোনো কিছু না জানিয়ে গ্রাম ছেড়ে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরের এক রাজ্যে গিয়ে পৌঁছাল। সেখানে পৌঁছে তার আনন্দ আর ধরে না। ঘরে ঘরে খাবারের অভাব নেই। লোকের মুখে হাসি। এই দেখে সে সুযোগ বুঝে পথের পাশের একটা বাড়িতে ঢুকে পড়ল।

বাড়িটার দরজা হাট করে খোলা। কেউ কোথাও নেই। একটি বউ ঘোমটা দিয়ে দাওয়ায় বসে একমনে চাল বাছছিল। সে ফিরেও তাকাল না। চিত্রাঙ্গ দু'একবার উঁকিঝুঁকি দিয়ে এদিক ওদিক দেখে ঢুকে গেল একেবারে রান্নাঘরে। তারপর অনেকদিন বাদে পেট ভরে ভালো-মন্দ খেয়ে খুশি মনে বেরিয়ে এল।

রাস্তায় বের হতেই তাকে ঘিরে ধরল সেখানকার পথের কুকুরেরা। তারপর সে কী চেঁচামেচি। অন্য জায়গার কুকুর দেখে দাঁত খিঁচিয়ে সবাই মিলে তেড়ে এল। চিত্রাঙ্গ তখন প্রাণ নিয়ে কোনোমতে ছুটতে ছুটতে একটা পোড়োবাড়ির ভেতর লুকিয়ে পড়ল।

এভাবে সে ওই বাড়ির ভেতর লুকিয়ে থাকে আর সুযোগ বুঝে গৃহস্থের বাড়িতে ঢুকে চুরি করে ভালো-মন্দ খায়। চিত্রাঙ্গ বুঝে গেল একানকার বাড়ির বউ-ঝিরা অতটা সাবধানী নয়। কুকুর-বেড়ালের দিকে অতটা খেয়াল রাখে না। কিন্তু তাহলে হবে কী! এখানকার কুকুরগুলো তাকে মোটেই পাত্তা দেয় না। দেখতে পেলেই আঁচড়ে কামড়ে শেষ করে দেয়। এভাবে যে আর কত জ্বালা সহ্য করবে। শেষকালে দুত্তোর, ভালো খাবারের নিকুচি করেছে, বলে সে আবার নিজের

গ্রামে ফিরে আসার মনস্থ করল। সেখানে আর যাই হোক, তার পরিচিত কুকুরেরা তো আর তাকে কামড়াতে আসবে না। নিজের গ্রামে নির্ভয়ে থাকাই ভালো।

নিজের গ্রামে ফিরে আসতেই তার পরিচিত জাতভাইয়েরা লেজ নেড়ে তাকে ঘিরে ধরল। অনেকে অবশ্য না খেতে পেয়ে মারা গেছে। তারা সবাই জানতে চাইল, ভিন রাজ্যে কেমন ছিলে? সেখানকার লোকজন কেমন? খাবারদাবারের অভাব নেই তো?

চিত্রাঙ্গ হেসে বলল, সেখানকার কথা আর কী বলব? লোকজন ভালো। ঘরে ঢুকে সব চেটেপুটে খেয়ে ফেললেও কেউ খেয়াল করে না। খাবারদাবারও প্রচুর। কিন্তু সেখানকার কুকুরগুলো খুব বজ্জাত। তাদের জ্বালায় টিকতে পারলাম না। নিজের জায়গায় উপোস করে মরা ভালো কিন্তু খাবারের জন্য নিত্যদিন জাতভাইদের দাঁতখিচুনি সহ্য করা যায় না।

পৃথ্বীরাজ সেন

জাতীয় উদ্যান

নামদাফা

নামদাফা ন্যাশনাল পার্ক উত্তর-পূর্ব ভারতের অরুণাচল প্রদেশের মায়ানমার সীমান্তে চাংলাং জেলায় অবস্থিত। ১৯৮৫ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত এই উদ্যান। ১৯৭২ সালে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়। ১৯৮৩ সালে বাঘ সংরক্ষণাগারে পরিণত করা হয়। এই উদ্যানে রয়েছে ১০০০ রকমের ফুল, ৪৩০ রকমের পোকামাকড়, ৭৬ রকমের মাছ, ৫০ রকমের সরীসৃপ, ৪২৫ প্রজাতির পাখি এবং ১৪০০ প্রজাতির জীবজন্তু। জন্তুজানোয়ারের মধ্যে ঢোল, সূর্য ভাল্লুক, কালো ভাল্লুক, নেকড়ে, লাল পাণ্ডা, লাল শেয়াল, হাতি, উদবেড়াল, বন বেড়াল, বিভিন্ন প্রকারের বেজি, কস্তুরি মৃগ দেখা যায়। পাখির মধ্যে পাঁচ রকমের হর্নবিল, সাদা ডানাওয়ালা উড হাঁস বিখ্যাত।

এসো সংস্কৃত শিখি– ৫৩

স্ত্রীলিঙ্গে

এষা – এতা: (এ– এরা)

এষা কা ?– এতা: কা: ? (এ কে?– এরা কারা?)

এষা শিক্ষিকা – এতা: শিক্ষিকা:।

(ইনি শিক্ষিকা– ইনারা শিক্ষিকা)

অভ্যাস কুর্ম:--

এষা বালিকা – এতা: বালিকা:। এষা বৈদ্যা – এতা: বৈদ্যা:। এষা গায়িকা– এতা: গায়িকা:। এশা সেবিকা–এতা: সেবিকা:। এষা লেখিকা– এতা: লেখিকা:।

প্রয়োগ কুর্ম:

(মহিলা, নায়িকা, পালিকা, ভৃত্যা, পরিচারিকা,)

(দ্বিচক্রিকা, মালা, পত্রিকা, শাটিকা, ছুরিকা, মক্ষিকা, পিপীলিকা, দোলা)

ভালো কথা

কাটুস-কুটুস

দু'মাস আগে আমার বাবা মাঠ থেকে ফেরার সময় রাস্তার ধারে দুটো কুকুরছানা পড়ে থাকতে দেখে বাড়িতে নিয়ে আসে। তখন খুবই ছোটো ছিল। ঠাকুমা বলছিল, আহা, কে যেন ফেলে দিয়ে গেছে! শীতে ঠকঠক করে কাঁপছিল। মা আগুনের তাপ দিয়ে সুস্থ করেছে। প্রথম দু'তিন দিন ওরা শুধু দুধ খেয়ে থাকত। এখন দুধভাত খায়। সারা বাড়ি দৌড়ে বেড়ায়। বাবা বস্তা আর খড় দিয়ে ওদের থাকার জায়গা করে দিয়েছে। সারাদিন ওখানেই থাকে আর ছোটাছুটি করে। কিন্তু রাতে ঠাকুমার বিছানায় উঠে শুয়ে থাকে। ঠাকুমা ওদের কিছু বলে না। আমি ওদের একটার নাম দিয়েছি কাটুস, আর একটার কুটুস।

শৈবাল মাহাত, সপ্তম শ্রেণী, কোতুলপুর, বাঁকুড়া

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

গঙ্গাসাগর

সায়ন্তন মণ্ডল, দ্বাদশ শ্রেণী, নামখানা, দঃ ২৪ পরগনা।

ভারতবর্ষ বড়ো দেশ
কত রঙ্গ কত খেলা,
বঙ্গভূমে গঙ্গাসাগর
প্রয়াগরাজে কুম্ভমেলা।
দেশ বিদেশের কত মানুষ
কত সাধু সন্ন্যাসী
সবাই মিলে ছুটে আসে
পুণ্যলাভের প্রত্যাশী।

কুম্ভমেলা বড়ো মেলা
জুড়ি মেলা ভার
অপেক্ষায় থাকতে হয়
তর সয় না যে আর।
গঙ্গাসাগর প্রতি বছর
ঘুরে ঘুরে আসে,
গঙ্গাসাগর প্রিয় মেলা
আমার বাড়ির পাশে।

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com, www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206 9748978406
Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com
NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

অপারেশন মরিচঝাঁপি : সিপিএমের এক কলঙ্কিত অধ্যায়

অধ্যাপক গোপাল চক্রবর্তী

দেশভাগের পর থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বর্তমান বাংলাদেশ থেকে দলে দলে হিন্দু বাঙ্গালি উদ্বাস্তু এই রাজ্যে এসেছে আশ্রয় ও উপার্জনের খোঁজে। এই উদ্বাস্তুদের এক সময় আন্দামান দ্বীপে পুনর্বাসনের একটা পরিকল্পনা মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় গ্রহণ করেছিলেন। তাতে হয়তো এই সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান হয়ে যেতো। কমিউনিস্টরা এই পরিকল্পনার তীব্র বিরোধিতা শুরু করে এবং উদ্বাস্তুদের নানাভাবে প্ররোচিত করে আন্দামান যাত্রা ব্যাহত করে। কমিউনিস্টদের প্ররোচনা উপেক্ষা করে যাঁরা সেদিন আন্দামান পাড়ি দিতে পেরেছিলেন আজ তাদের সেখানে সোনার সংসার।

শেষপর্যন্ত ১৯৫৮ সালের দিকে বাঙ্গালি হিন্দু উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য দণ্ডকারণ্য বেছে নেওয়া হলো। দণ্ডকারণ্য এমন একটা এলাকা— যার কিছুটা ওড়িশার অন্তর্ভুক্ত, কিছুটা মধ্যপ্রদেশের, কিছুটা মহারাষ্ট্রের আর কিছুটা অংশ অন্ধ্রপ্রদেশের। এখানকার আকাশ বৃষ্টিহীন, মাটি রুক্ষ্ম -শুষ্ক, অনুর্বর, কাজকর্মের কোনো সংস্থান নেই। সেখানে পাঠানো হলো পূর্ববঙ্গের সর্বহারা উদ্বাস্তুদের। সেখানে কেন্দ্র সরকার পরিচালিত 'দণ্ডক-প্রশাসন' সুদীর্ঘ কুড়ি বছরেও উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি। তাছাড়া বাঙ্গালি উদ্বাস্তুরা বিভিন্ন সময়ে স্থানীয়দের দ্বারা নির্যাতিত নিপীড়িত হচ্ছিল। স্থানীয় প্রশাসনের কাছে বার বার আর্জি জানিয়েও কোনো সুবিচার পাওয়া যায়নি।

ফলে উদ্বাস্তুদের মধ্যে একতটা ক্ষোভের আগুন জ্বলছিল। ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হয় সিপিএমের নেতৃত্বে। এই সময় বামফ্রন্টের এক মন্ত্রী রাম চ্যাটার্জি ও উদ্বাস্তুনেতা সতীশ মণ্ডল দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তুদের নিয়ে কয়েকটি সভা করেন। সেখানে রাম চ্যাটার্জি প্রতিশ্রুতি দেন এখন পশ্চিমবঙ্গে বাম সরকার যারা উদ্বাস্তুদের প্রতি সহানুভুতিসম্পন্ন। দ্রুত এই উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। এই প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে উদ্বাস্তুনেতা সতীশ মণ্ডল ধ্বনি তুললেন 'সুন্দরবন চলো'। তারপরই শুরু হলো উদ্বাস্তুদের সুন্দরবন অভিযানের পালা। দণ্ডকারণ্যের আশ্রয় ছেড়ে বঙ্গের মাটিতে একটা সুন্দর নিরুপদ্রব জীবন যাপনের আশায় একটা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে আবার গৃহহারা হলো হতভাগ্য বাঙ্গালি উদ্বাস্তুরা। সবার গন্তব্য পশ্চিমবঙ্গ, সুন্দরবন।

১৯৭৮-এর ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তুরা প্রথমে ভিড় জমিয়েছিল হাসনাবাদে। তখন তাঁরা সংখ্যায় কম হলেও মার্চের মাঝামাঝি সময়ে তারা সংখ্যায় বেশ ভারি হয়ে উঠল। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন হাজার হাজার উদ্বাস্তু। রেলের প্ল্যাটফর্ম, গাছতলা, রাস্তারধারে সর্বত্র এই ছিন্নমূলরা। না, সেদিন এই হতভাগ্য মানুষদের পাশে কেউ দাঁড়ায়নি। স্থানীয় মুসলমানরা তাদের বাড়ির আশেপাশে আশ্রয় নেওয়া উদ্বাস্তুদের সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে বিতাড়িত করেছে। একমাত্র উদ্বাস্তুদের সাহায্য ও সেবার জন্য প্রথম এগিয়ে এল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ। ইতিমধ্যে অনেকেই পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত, বিপদসঙ্কুল অঞ্চলে চলে গেছে। তাদের দাবি বসবাসের জন্য তাদের জমি দিতে হবে। রাজনীতির বাবুরা তখন প্যালেস্টাইনের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য গলা ফাটাচ্ছে। রাতদিন এক করে মিটিং মিছিল করছে। আর এই দেশভাগের শিকার ছিন্নমূলদের নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। নিরুপায় দণ্ডক উদ্বাস্তুরা তখন দলে দলে বিনা বাধায় সুন্দরবনের বাগনা ও কুমিরমারি এলাকায় ঢুকছে।

লক্ষ্য সবার মরিচঝাঁপি। মরিচঝাঁপি রায়মঙ্গল আর বাগনা নদীর সৃষ্ট একটি দ্বীপ। এটি সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার। বাঘ ও মানুষের জগতের মধ্যে একটি বাফার এলাকা, যাতে বন বিভাগ ঝাউ ও নারকেলের চারা রোপণের একটি উদ্যমহীন প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। এই মরিচঝাঁপিতে হাজার মানুষ তখন একটা নতুন বসতি গড়ার উৎসবে মেতেছে। সবাই কোনো না কোনো কাজ করছে। কোথাও ডিঙ্গি নৌকা তৈরি করছে। কোথাও বসেছে কামারশালা ও হাপর। কোথাও চেরাই হচ্ছে কাঠের গুঁড়ি। ছককেটে বসানো হয়েছে বাজার। সোজা রাস্তা, ইসকনের চালা। ভেড়ির জন্য ছেলেরা বানাচ্ছে কল। যেন তারা রাতারাতি তৈরি করে ফেলবে তাদের ফেলে আসা প্রিয় বসতি নতুন করে। সারি সারি ঘর, প্রায় গায়ে গায়ে লাগানো, উপকরণ সামান্য— হোগলা পাতা, গাছের ডাল, বাঁশ, কঞ্চি, পলিথিন শিট, দড়ি, পেরেক ইত্যাদি। ঘর বলার চেয়ে কুঁড়ে বলা বোধহয় বেশি যথাযথ কিন্তু আশ্চর্য সুন্দর, এক মাপের, একটুখানি দাওয়া, তুলসী মঞ্চ, —ছবির মতো। এই বঙ্গের সুন্দর বনে নির্জন দ্বীপের মাটিতে তাঁরা নিজেদের প্রাণপণ করে গড়ে তুলেছেন বাসভূমি, ছেড়ে আসা দেশের খাণ্ডস্মৃতির ছায়ামাখা, মায়াজড়ানো।

না, সেই স্বপ্ন তাদের সফল হলো না। সেই স্বপ্ন ভঙ্গ করার জন্য পাকিস্তান আসেনি, বাংলাদেশ আসেনি, সেই স্বপ্ন ভেঙেচুরে মাটিতে মিশিয়ে দিল পশ্চিমবঙ্গের গরিব দরদি বামফ্রন্ট সরকার। পরিবেশ রক্ষার অজুহাতে সেই ছিন্নমূলদের মরিচঝাঁপি ছেড়ে যাওয়ার সরকারি নির্দেশ এল। ওরা যখন কিছুতেই মরিচঝাঁপি ছাড়তে রাজি হলো না। তখন বামফ্রন্ট কেন্দ্রীয় আইন প্রয়োগ করলো। ১৯৭৯ সালের ২৬ জানুয়ারি ওই আইন মোতাবেক জলপথে মরিচঝাঁপিতে যাতে কেউ খাদ্যদ্রব্য, পানীয়জল, ওষুধপত্র পাঠাতে বা নিয়ে যেতে না পারে সেজন্য শ'খানেক লঞ্চ ও নৌকা দিয়ে পুলিশ মরিচঝাঁপি দ্বীপ ঘিরে ফেলল। মরিচঝাঁপিতে ১৪৪ ধারা জারি হলো।

প্রায় ৪০ হাজার উদ্বাস্তু অধ্যুষিত মরিচঝাঁপিতে আড়াই থেকে তিন হাজার শিশুর বাস ছিল। রাষ্ট্রসঙ্ঘ ১৯৭৯ সালকে 'আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ' ঘোষণা করেছিল। অথচ জ্যোতিবসু শিশুবর্ষে তিন হাজার শিশুর মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে এতটুকু দ্বিধা করেননি। দীর্ঘ অবরোধের ফলে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও মানসিক চাপে অস্থির উদ্বাস্তুরা যখন জোর করে বাইরে যেতে চায়, তখন পশ্চিমবঙ্গের বীরপুঙ্গব পুলিশ গুলি চালায়। পুলিশের ক্রমাগত অত্যাচারে ক্ষিপ্ত উদ্বাস্তুরা পুলিশকে লক্ষ্য করে তির ছুড়তে থাকে। তাতে কয়েকজন পুলিশ কর্মী আহত হয়। পুলিশ তখন নির্বিচারে কাঁদানে গ্যাস ও গুলি চালাতে থাকে। তারপর মরিচঝাঁপিতে পুলিশ উদ্বাস্তুদের উপর যে তাণ্ডব চালায় তা ৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালিদের উপর পাকবাহিনীর অত্যাচারকেও হার মানায়। তাদের বর্বর আক্রমণ থেকে মহিলা ও শিশুরাও বাদ যায়নি। ওপারের পাকবাহিনীর সহযোগী রাজাকার আলবদরের মতো এপারের সিপিএম ক্যাডাররাও পুলিশের সঙ্গ দেয় এবং ব্যাপক লুটপাট করে। 'অপারেশন মরিচঝাঁপি'তে যে মোট কত জনের প্রাণ গিয়েছে তার কোনো সঠিক হিসাব পাওয়া যায়নি। হানাদারদের বিরুদ্ধে কোনো কমিশন বসেনি, বিচার হয়নি। জ্যোতি বসু এবং তাঁর পারিষদবর্গ ক্রমাগত মিথ্যার পর মিথ্যার আস্তরণে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি চাপা দিয়েছেন। উদ্বাস্তুদের স্বপ্নের সমাধি ঘটিয়েছে মরিচঝাঁপিতে। জনতা ও শিশুদের কলকোলাহলে মুখরিত এক জনপদকে পরিণত করেছে শ্মশানের নিস্তব্ধতায়।

ফঃ ৬

জমজমাট প্রথম খো খো বিশ্বকাপ

নিলয় সামন্ত

খো খো সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় খেলা। বার্লিন অলিম্পিকে ১৯৩৬ সালে খো খো খেলা প্রদর্শনী হিসেবে প্রদর্শিত হয়েছিল। তারপর খো খো সংস্থার কর্তাদের ব্যর্থতায় খেলাটাকে তেমনভাবে আন্তর্জাতিক আঙিনায় আর দেখা যায়নি। কিন্তু এখন আবার আন্তর্জাতিক স্তরে খো খো খেলাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া গিয়েছে। ২০২৩ সালে গুয়াহাটিতে আয়োজিত হয়েছিল এশিয়ান খো খো চ্যাম্পিয়নশিপ। আর এবার দিল্লিতে চলছে প্রথম বিশ্বকাপ খো খো প্রতিযোগিতা। বিশ্বের ২৪টি দেশ অংশ নিয়েছে এই প্রতিযোগিতায়।

খো খো বিশ্বকাপের উদ্বোধনী সংস্করণ ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামে একটি প্রাণবন্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুরু হয়েছে। ভারত ও নেপালের মধ্যে টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ দিয়ে শুরু হয়েছিল ইভেন্ট। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়, কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রী মনসুখ মান্ডাভিয়া, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী রক্ষা খাডসে, আইওএ সভাপতি পিটি ঊষা, দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর বিনয় কুমার সাক্সেনা-সহ হাজার হাজার ক্রিড়াপ্রেমী স্টেডিয়ামে ভিড় করেছিলেন। আইকেকেএফ এবং খো খো ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া সভাপতি সুধাংশু মিত্তাল ২৩টি দেশের খেলোয়াড়দের পুরুষ ও মহিলাদের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য স্বাগত জানিয়েছেন। উদ্বোধনী ভাষণ দিতে গিয়ে কেকেএফআই সভাপতি সুধাংশু মিত্তাল বলেন, 'আমি এখানে উপস্থিত থাকার জন্য এবং তাদের সমর্থন প্রদর্শন করার জন্য সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ধন্যবাদ জানাই। খো খো-কে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের স্বপ্ন ছিল এবং এই টুর্নামেন্টের মাধ্যমে আমাদের স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে। পিটি ঊষা বলেন, 'খো খো কেবল একটি খেলা নয়, এটি ভারতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের একটি প্রমাণ। আসুন, আমরা সকলে খেলার চেতনাকে সমুন্নত রাখি এবং প্রতিযোগিতার মর্যাদাকে সমুন্নত রাখি। খো খো বিশ্বকাপ আমাদের আবেগকে নতুন করে তোলে। আমাদের দেশীয় খেলার জন্য আমি

সকল সম্মানিত ব্যক্তিদের তাদের উপস্থিতি এবং তাদের সমর্থনকে ধন্যবাদ জানাই।'

কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডাভিয়া বলেন, 'নিজের দেশে এই দুর্দান্ত টুর্নামেন্টের আয়োজন করতে পেরে আমি গর্বিত। ভারত থেকে উদ্ভুত খো খো এখন ৫০টি দেশ নিয়ে খেলা হচ্ছে। খো খো ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার সভাপতি সুধাংশু মিত্তালজী খেলার প্রচারের জন্য বিস্ময়কর কাজ করেছেন। আমি আশা করি শীঘ্রই এশিয়ান গেমস ও অলিম্পিকে খো খো খেলা দেখতে পাব।' ভারতের উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় বলেন, কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী রক্ষা খাডসে-সহ বিশিষ্টরা আনুষ্ঠানিকভাবে খো খো বিশ্বকাপের উদ্বোধনের জন্য মশাল জ্বালিয়েছেন। এটি টুর্নামেন্টের একটি দর্শনীয় সূচনা হয়েছে। মনে হচ্ছে পুরো বিশ্ব খো খো উদ্‌যাপন করছে। আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ্যটি আমাদের ক্রীড়ার সোনালি ইতিহাস হয়ে থাকবে। সুধাংশু মিত্তাল এমন একটি চমৎকার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। আমি আত্মবিশ্বাসী যে আগামীতে আমাদের নিজস্ব দেশীয় খেলা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। খো খো খেলা একটি শিল্প। এটার জন্য ক্ষিপ্রতা, গতি ও চতুরতা প্রয়োজন আমি টুর্নামেন্টের জন্য সমস্ত অংশগ্রহণকারী দেশকে শুভেচ্ছা জানাই।'

উদ্বোধনের এক সপ্তাহ পর চূড়ান্ত পর্বে উদ্বোধনী খো খো বিশ্বকাপে জয়জয়কার ভারতের। পুরুষ ও মহিলা দুই বিভাগেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারতীয় দল। নয়াদিল্লিতে প্রথমে মেয়েদের বিভাগে ভারত ৭৮-৪০ ফলে হারায় নেপালকে। অধিনায়ক প্রিয়াঙ্কা ইঙ্গলে দুরন্ত ছন্দে ছিলেন। যার সাহায্যে মেয়েরা দ্রুত ৩৪ পয়েন্ট তুলে নেয়। সেখানেই ম্যাচে ফেরার আশা নেপালের শেষ হয়ে যায়। ফাইনালে ওঠার পথে ভারতের মেয়েরা গ্রুপ পর্বে দাপটে হারায় দক্ষিণ করিয়া, ইরান, মালয়েশিয়াকে। এরপরে কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলাদেশ ও সেমিফাইনালে জয় পায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। পুরুষদের বিভাগেও বিপক্ষে ছিল নেপাল। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই নেপালকে হারিয়ে দেয় ভারত। ফাইনালেও সেই দাপট ধরে রেখে ভারত ৫৬-৩৬ পয়েন্টে জয় পায়। এক সময় ২৬-০ পয়েন্ট এগিয়ে গিয়েছিল ভারত। কিছুক্ষণ পরে স্কোর দাঁড়ায় ২৬-১৮। এর পরে আক্রমণে আর জোর বাড়ায় ভারতীয় দল। এবার স্কোর দাঁড়ায় ৫৬-১৮। সেখান থেকে আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি নেপাল। ভারতীয় দল প্রথম ম্যাচে নেপালকে ৪২-৩৭ পয়েন্টে হারায়। তারপরে শাসন ধরে রেখেছিল পরের ম্যাচগুলিতেও। সেমিফাইনালে দারুণ লড়াই করেও ভারতের পুরুষ দলের বিরুদ্ধে জিততে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা। □

অভয়ার বাবা-মায়ের মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চাওয়া কী অন্যায়?

বিশ্বপ্রিয় দাস

একটি মানুষকে প্রশাসনের ষড়যন্ত্রে যদি পৃথিবী থেকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কী তাঁর প্রতি সঠিকভাবে বিচার হলো? নাকি প্রশাসনের দোষকে চাপা দিতে একটি মানুষকে বলি দেওয়া হলে সব দোষ চাপা পড়ে গেল? এমনটাই ধারণা যদি প্রশাসনের হয়, সেটি যে সঠিক, সেই বিষয়টির বিচার্য কারণ কী হবে, সেটা নিয়েও প্রশ্ন ওঠা যে অস্বাভাবিক নয়, সেটাও বিচার্য হওয়া উচিত।

এই প্রতিবেদক আজ থেকে প্রায় ২১ বছর আগের সেই ঘটনার খবর করার জন্য প্রায় মাটি কামড়ে পড়েছিল বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত একটি গ্রামে। ১৯৯০ সালে ৫ মার্চ, ভবানীপুরের পদ্মপুকুর রোডে হেতাল পারেখ নামে এক স্কুলছাত্রীকে হত্যা করা হয়েছিল। আর ওই বাড়ির এক নিরাপত্তা রক্ষী ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়কে পারিপার্শ্বিক প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে মৃত্যুদণ্ড পেতে হয়েছিল। সেই সময়ে তাঁর মৃত্যু চেয়ে পথে নেমেছিলেন সেই সময়ের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্ত্রী মীরা ভট্টাচার্য। সেদিন আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়নি ধনঞ্জয়কে। সে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বলে গিয়েছিল, সে দোষী নয়। আর তাঁর একটি কথা আজও বোধহয় সবার স্মরণে আছে, যে ভবিষ্যতে যেন পুলিশি তদন্ত সঠিক পথে চালিত হয়। এই কথাটি নিয়েই আজও আলোচনা আপামর দেশবাসীর মনে। সেদিনের সঙ্গে অভয়াকাণ্ডের মিল বেশ কিছু জায়গায় সেদিন রাস্তায় নেমেছিলেন সেই সময়ের মুখ্যমন্ত্রী জায়া, আর আজ সঞ্জয়ের মৃত্যুদণ্ড চেয়ে পথে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী সপার্ষদ।

মিল আরেক জায়গায়, পুলিশি তদন্তের বিষয়টিতেও। সেদিনের সেই পুলিশি তদন্তের সব দিকগুলি যেমন মেনে নিতে পারেননি ধনঞ্জয়ের পরিবার, আজও তেমনি প্রমাণ লোপাটের দোষে দুষ্ট পুলিশের ভূমিকাকে মেনে নিতে পারছেন না আরজি করের নিহত চিকিৎসক, অভয়ার মা-বাবা।

কাকে বা কাদের আড়াল করতে রাজ্য প্রশাসনের মাথারা আজ এত একগুঁয়ে? সেই প্রশ্ন ঘুরছে সবার মুখে মুখে। ধনঞ্জয়ের মুখ বন্ধ রাখা হয়েছিল কাদের আড়াল করার জন্য, আর সঞ্জয়ের মুখ খুলতে দেওয়া হচ্ছে না কাকে বা কাদের আড়াল করার জন্য, সেটাও সাধারণ মানুষ আজ জানতে চাইছে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। মহামান্য আদালত একটি রায় দিয়েছে পারিপার্শ্বিক প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে। সেখানে বিচারকের হয়তো মনে হয়েছে, যে ভবিষ্যতে আরও কিছু এই কেসের থেকে বেরোতে পারে। কেননা অভয়ার হত্যা কিন্তু একটি প্রাতিষ্ঠানিক, নিষ্ঠুর থেকে ভয়ংকরতম ঘটনা। অবশ্যই বিরলের মধ্যে বিরলতম। যে ঘটনা একটি সরকারি ক্ষেত্রে ঘটে যাওয়া ঘটনা। তার দায় রাজ্য সরকার কি এড়িয়ে যেতে পারে? এই সরকারের প্রধানের হাতে যখন রয়েছে দুটি প্রধান দপ্তর, সেখানে হত্যা হয়েছে, সেই স্বাস্থ্যক্ষেত্র, অর্থাৎ সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, আর প্রমাণ লোপাটের দোষে দুষ্ট, স্বরাষ্ট্র দপ্তর অর্থাৎ কলকাতা পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রী কি এই দায় এড়াতে পারেন? তাঁর কি দায় নয় যে সঠিক প্রমাণ দিয়ে এই ঘটনার সত্যতাকে সামনে আনা?

সম্প্রতি রাজ্যের শাসক দলের এক মুখপাত্র গলার শিরা ফুলিয়ে, নাটুকে ঢঙে, নিহত অভয়ার বাবা-মাকে উদ্দেশ্য করে নানা কথা বলছেন। আচ্ছা বলুনতো তিনি কী ধরনের নিম্নরুচির রাজনীতি করছেন? একজন সন্তানহারা বাবা-মা, যারা কঠিন বাস্তবতাকে চাক্ষুষ করেছেন, তাঁরা তাদের বিরুদ্ধে রাজনীতির ময়দানে কেন নামতে যাবেন? শ্রদ্ধেয় মুখপাত্র, আপনি এর পিছনে আবার কারোর উসকানিও দেখতে পেয়েছেন। সত্যি ভাবতে অবাক লাগে, একজন সন্তানহারার হাহাকার কারোর উসকানিতে হয়?

এক মন্ত্রী, তিনি আবার বলেই দিলেন, সারা রাজ্যের মানুষ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ওই আসনে বসিয়েছেন, তাঁর পদত্যাগ চাইবার অধিকার কি আছে অভয়ার বাবা-মায়ের? সত্যি তো আপনারা গণদেবতার দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি, কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন কেন মন্ত্রীমশাই, সেই গণদেবতার একজন হলেন ওই অভয়ার বাবা-মা, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও তাঁর পিছনে থাকা আপামর সুবিচার চাওয়া সাধারণ মানুষ। আপনাদের ঔদ্ধত্য মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। ক্ষমতার দম্ভে আপনারা পাগল। তাই আজ আপনাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত নানা দোষের চাদরে চাপা। কলঙ্কে কালিমাময়।

ধনঞ্জয়ের সময়েও উঠে আসেনি নানা অসঙ্গতি, এখনও হয়তো হবে না। কেননা এই অসঙ্গতিকে চাপা দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নানা কৌশলী এক যোগে কাজ করছেন। একটি প্রাতিষ্ঠানিক হত্যা কি সহজে ধামাচাপা দেওয়া যাবে? সেই প্রশ্নের উত্তর হয়তো ভবিষ্যৎ বলবে।

শোকসংবাদ

মালদা জেলার কলিগ্রামের গোস্বামী পরিবারের কন্যা প্রণতি গোস্বামী গত ২৩ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। তিনি বালিকা বয়সেই রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির সঙ্গে যুক্ত হন। গ্রামে সরস্বতী শিশুমন্দিরে প্রধান আচার্যের দায়িত্ব পালন করেছেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তর মালদা জেলা মাতৃশক্তি সংযোজিকার দায়িত্ব পালন করেছেন। গত ২৭ জানুয়ারি কলিগ্রাম শিশুমন্দিরে তাঁর স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য অদ্বৈতচরণ দত্ত, বিভাগ প্রচারক অধীন সিংহ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ক্ষেত্র সামাজিক সমরসতা প্রমুখ গৌতম সরকার।

সফলভাবে উৎক্ষেপিত হলো ভারতের প্রথম প্রাইভেট স্যাটেলাইট কনস্টেলেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গত ১৫ জানুয়ারি, ভারতের প্রথম প্রাইভেট স্যাটেলাইট কনস্টেলেশন (উপগ্রহগুচ্ছ) সফলভাবে উৎক্ষেপিত হয়েছে। গত ১৭ জানুয়ারি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর এক্স-হ্যান্ডলে ভারতের প্রথম প্রাইভেট স্যাটেলাইট কনস্টেলেশন উৎক্ষেপণ করার জন্য 'পিক্সেল স্পেস'-এর প্রশংসা করে পোস্ট করেছেন। এই পোস্টে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, 'এটি ভারতীয় তরুণদের অসাধারণ প্রতিভা এবং মহাকাশ শিল্পে প্রাইভেট সেক্টরের (বেসরকারি ক্ষেত্রের) ক্রমবর্ধমান দক্ষতার বিষয়টি উপস্থাপিত করে।' উল্লেখ্য, পিক্সেল ব্যাঙ্গালোর-স্থিত একটি স্পেস স্টার্টআপ কোম্পানি। সংস্থাটির তরফে প্রস্তুত দেশের প্রথম প্রাইভেট স্যাটেলাইট পিক্সেল ২০২২ সালের এপ্রিলে মহাকাশ যাত্রা শুরু করেছিল। গত ১৫ জানুয়ারি, তারা দেশের প্রথম প্রাইভেট ইমেজিং স্যাটেলাইট কনস্টেলেশন লঞ্চ করেছে। ইলন মাস্কের কোম্পানি স্পেস-এক্সের ফ্যালকন-৯ রকেট ব্যবহার করে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার ভ্যানডেনবার্গ স্পেস ফোর্স বেস থেকে স্যাটেলাইট কনস্টেলেশনটিকে উৎক্ষেপণ করা হয়। 'ফায়ারফ্লাই কনস্টেলেশন'-এর তিনটি উপগ্রহ পৃথিবীর কক্ষপথের ৫০০ কিলোমিটার নীচে স্থাপন করা হয়েছে।

পিক্সেলের স্যাটেলাইটগুলির মূল উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীর কক্ষপথে উপস্থিত মহাজাগতিক বস্তুগুলি পর্যবেক্ষণ করা এবং পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি সঠিকভাবে রেকর্ড করা। পিক্সেলের সাফল্যকে অভিনন্দন জানিয়ে ইসরোর প্রাক্তন প্রধান ড. এস সোমনাথ জানিয়েছেন যে, 'হাইপারস্পেক্ট্রাল ইমেজিং ক্ষমতার প্রভাব মহাকাশ ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য একটি বড়ো উপহার হিসেবে প্রমাণিত হবে।' এই পিক্সেল স্যাটেলাইটগুলি জলবায়ু সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পৃথিবী সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। পিক্সেল স্পেস নির্মিত ফায়ারফ্লাই কনস্টেলেশন উন্নত স্পেক্ট্রাল ক্ষমতা, রিয়েল টাইম ডেটা সংগ্রহ এবং বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশন-সহ সজ্জিত রয়েছে। এখনও পর্যন্ত, ভারতের আর্থ ইমেজিং স্যাটেলাইটগুলি প্রধানত ইসরো দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। তাদের অধীনে ৫২টি উপগ্রহ রয়েছে। ২০২৯ সালের মধ্যে স্যাটেলাইট ইমেজারির বাজার দাঁড়াবে ১৯ বিলিয়ন ডলারে। তার মধ্যে অপেক্ষাকৃত নতুন প্রযুক্তি সংবলিত হাইপারস্পেক্ট্রাল ইমেজিং ৫০০ মিলিয়ন ডলার থেকে ১ বিলিয়ন ডলারের বাজার সৃষ্টির সম্ভাবনাসম্পন্ন। পিক্সেলের মতো কোম্পানিগুলি বেসরকারি ক্ষেত্রে মহাকাশ গবেষণা এবং উপগ্রহ উৎক্ষেপণকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছে।

সিন্ধু জল চুক্তিতে ভারতের জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সিন্ধু জল চুক্তি লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে পাকিস্তান যে আপত্তি তুলেছিল, তা সম্পূর্ণরূপে বাতিল করেছে বিশ্ব ব্যাংকের নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ দল। জম্মু-কাশ্মীরের কিষাণগঙ্গা ও রাতলের জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে ২০১৫ সালে পাকিস্তান আপত্তি জানিয়েছিল। তার পরেই নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ দল এর ব্যাপারে পর্যালোচনা করে। যার বিস্তারিত রিপোর্ট অনুযায়ী পাকিস্তানের দাবিকে বাতিল করা হয়।

রায় ঘোষণার পর ভারত সরকারের বিদেশ মন্ত্রক একটি বিবৃতি দেয়, ভারত ১৯৬০ সালের সিন্ধু জল চুক্তির অ্যানেক্সচার এফ-এর অনুচ্ছেদ ৭ অনুযায়ী নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ দলের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায়। এই সিদ্ধান্ত ভারতের অবস্থানকে সমর্থন করে এবং সঠিক প্রমাণ করে।

নদীয়ায় গোপন বাঙ্কারের মধ্যে কোটি টাকার পাচার সামগ্রী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি।। নদীয়ার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মাজদিয়া এলাকায় এক বাগানের মধ্যে তিনটি গোপন বাঙ্কারের মধ্যে কয়েক কোটি টাকার সামগ্রী উদ্ধার করে সীমা সুরক্ষা বল (বিএসএফ)।

একটি গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী বিএসএফের একটি দল মাজদিয়া নাগহাটা এলাকায় এক অভিযান চালায়। জঙ্গলে ঘেরা এলাকায় মাটিতে গোপন দরজা নজরে পড়ে। সেই দরজা খুলতেই প্রতিবন্ধিত কফ সিরাপ-সহ অন্যান্য সামগ্রীর পেটি উদ্ধার হয়। আরেকটু অনুসন্ধানের পর আরও দু'টি বাঙ্কারের সন্ধান পাওয়া যায়।

বিএসএফের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বহু জায়গা দিয়ে পাচারের খবর পাওয়া যায় এবং সেই অনুযায়ী মাঝে মধ্যেই অভিযান করা হয়। তেমনি এই অভিযানে বড়ো সাফল্য এসেছে। ৬২,২০০ বোতল প্রতিবন্ধিত ফেনসিডিল কফ সিরাপ উদ্ধার হয়েছে, যার অনুমানিক মূল্য দেড় কোটি টাকা। এছাড়াও আরও অন্যান্য সামগ্রীও পাওয়া গেছে। এই ধরনের অভিযান এর পরেও চলতে থাকবে।

মহাকুম্ভে অখিল ভারতীয় সন্ত সমাগমে একতা, সমতা, সমানতা ও সমরসতার বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভে অনুষ্ঠিত হলো অখিল ভারতীয় সন্ত সমাগম। গত ২১ জানুয়ারি মহাকুম্ভের সেক্টর ১৭-তে আয়োজিত হয় এই সম্মেলন। এই সম্মেলনে সমস্ত দেশ থেকে সন্তদের আমন্ত্রিত করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ সরকার্যবাহ ড. কৃষ্ণগোপাল বলেন, মহাকুম্ভ সারা বিশ্বকে অধ্যাত্মের বার্তা পৌঁছে দেবে। বিশ্বের কাছে এটি আদর্শ কুম্ভমেলা। এই সময় সমগ্র ভারত মহাকুম্ভে একত্রিত হয়েছে। প্রয়াগের পবিত্র মাটি সকল হিন্দুকে এক সূত্রে গাঁথার কাজ করছে। কুম্ভমেলা থেকে একতা, সমতা, সমানতা ও সমরসতার বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি সমাজ থেকে ভেদভাবকে সমাপ্ত করার সংকল্প নিতে হবে। তিনি আরও বলেন, মুঘল শাসনকাল থেকে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যায়। তীর্থযাত্রার জন্য কর দিতে হতো। আমাদের মঠ-মন্দির ধ্বংস করা হয়। হিন্দুসমাজে সংকীর্ণতা বাসা বেঁধেছিল। এমতাবস্থায় সামাজিক একতাও সংকটের মুখে পড়ে। এর ফলেই সমাজে নানান ভেদভাব ও কুরীতির প্রবেশ ঘটে। সমাজের অভ্যন্তরেই ব্যবধান নির্মাণ হয়। এই মহাকুম্ভমেলায় গঙ্গার পবিত্র ধারায় স্নান করে সমাজকে কুরীতি দূর করে সারা বিশ্বকে অধ্যাত্মের বার্তা দিতে হবে।

সামাজিক সমরসতা গতিবিধির অখিল ভারতীয় সংযোজক শ্যাম প্রসাদ সমাজের বৈষম্য দূর করতে সামাজিক সমরতার আবশ্যকতার কথা উল্লেখ করে বলেন, সন্ত সমাজের দ্বারা এই মহতী কাজ পূর্ণতা পেতে পারে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবজী ভাই বলেন, অনুসূচিত জাতির ভাইদের ষড়যন্ত্র করে ধর্মবিমুখ করার প্রক্রিয়া চলছে। আর্থিক বৈষম্যের কারণে ধর্মান্তকরণও বাড়ছে। সম্মেলনে উপস্থিত সন্তগণ মিলিতভাবে সমাজে একতা স্থাপনের জন্য সংকল্প গ্রহণ করেন।

গণতন্ত্র দিবসে সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ও সরকার্যবাহের বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গণতন্ত্র দিবসের এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত বলেন, সমগ্র বিশ্ব ভারতের কাছে নেতৃত্ব আশা করছে। ভারতকে এই পর্যন্ত নিয়ে আসতে বহু মানুষ নিজেকে সমর্পিত করেছেন। আমাদের সমর্পণের ভাবনা নিয়ে বিশ্বকে পথ দেখাতে হবে। আজ আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য সমর্পিত হয়ে কাজ করতে হবে। সমর্পণ ভাবনার সঙ্গে আমাদের কাজ ভারতকে বিশ্বগুরুর স্থানে পৌঁছে দেবে। গণতন্ত্র দিবসে মণিপুরের পশ্চিম ইম্ফলে ভাস্কর প্রভাতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবলে। তিনি বলেন, সংবিধানে নিহিত সাংস্কৃতিক আত্মার প্রতীক চিত্র আমাদের দেশের সমৃদ্ধ পরম্পরার পরিচয় প্রদান করে। নাগরিক মৌলিক কর্তব্যের উপর আমাদের সজাগ থাকতে হবে। ভারত ইতিহাসে বর্ণিত মনীষীদের থেকে আমাদের প্রেরণা নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি শ্রীরামচন্দ্র প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। সত্য পালনের জন্য তিনি নিজ অধিকার ত্যাগ করে ১৪ বছর বনবাস গ্রহণ করে নিজ কর্তব্য পালন করেন। হরিশ্চন্দ্রেরও সত্য পালনের উল্লেখ করে তিনি বলেন ভারতের আপ্তবাক্য রূপে তাই 'সত্যমেব জয়তে' শব্দ গ্রহণ করা হয়েছে। ভারত বিশ্বকে এক পরিবার মনে করে, তাই বলা হয়েছে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'। গণতন্ত্রের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখতে দেশের অখণ্ডতা ও একতা রক্ষার সংকল্প গ্রহণ করতে হবে।

প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভে প্রকাশিত হতে চলেছে হিন্দুদের আদর্শ আচরণবিধি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ হিন্দুত্ব একটি সম্পূর্ণ জীবন দর্শন। ভারতীয় জীবন পদ্ধতি ধর্ম ও শাস্ত্রীয় নির্দেশ আধারিত। ভারতে বৈদিক জ্ঞানের আলোকবর্তিকা হলো বারাণসী-স্থিত শ্রীকাশী বিদ্বৎ পরিষদ। বেদশিক্ষা ও বেদান্তভিত্তিক চর্চা ও গবেষণার প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান হলো বিদ্বৎ পরিষদ। গত ১৫ বছর ধরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বেদ-বেদান্ত বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে তাঁদের পরামর্শ ও মতামত সংগ্রহের মাধ্যমে হিন্দুদের পালনীয় আচরণবিধি রচনা করেছে পরিষদ। এই বছর উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে পূর্ণমহাকুম্ভে প্রকাশ্যে আসতে চলেছে প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠার এই খসড়া আচরণবিধি।

গত ২৫ জানুয়ারি থেকে মহাকুম্ভে শুরু হয়েছে ধর্মসংসদ। অখিল ভারতীয় সন্ত সমিতির সাধারণ সম্পাদক জিতেন্দ্রানন্দ সরস্বতী মহারাজ জানিয়েছেন যে, হিন্দুধর্মাচরণকারীদের সামাজিক জীবনযাপনের নির্দেশিকা-সহ হিন্দুসমাজের নানা আচার-অনুষ্ঠান পালনের বিধি এই হিন্দু কোড অফ কন্ডাক্টে বর্ণিত হয়েছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আয়োজিত ধর্মসংসদে উপস্থিত পূজনীয় শঙ্করাচার্য-সহ সাধুসন্তমণ্ডলীর মধ্যে এই বিধির বিষয়ে পারস্পরিক আলোচনা, প্রয়োজনীয় সংশোধনীর মাধ্যমে আচরণবিধিতে সংযোজন-বিয়োজন এবং সবশেষে তাঁদের অনুমোদনক্রমে প্রস্তুত হবে পূর্ণাঙ্গ আচরণবিধি। পুস্তক আকারে এই আচরণবিধি মুদ্রণ করে, তার কয়েক হাজার প্রতিলিপি মহাকুম্ভমেলায় উপস্থিত পুণ্যার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। বিভিন্ন সূত্রে জানা গিয়েছে যে, ধর্মসংসদে আলোচিত হতে চলা প্রস্তাবিত আচরণবিধিতে বলা হয়েছে যে, সূর্যকে সাক্ষী রেখে বিবাহ সর্বোত্তম। তাই রাত্রিকালীন বিবাহের পরিবর্তে দিনের বেলা বিবাহের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার বিষয়টি নির্দেশিত হয়েছে। কন্যাভ্রূণ হত্যাকে পাপ ও অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করেছে এই আচরণবিধি। পণপ্রথার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে এই বিধিতে। নারীকে সব দিক থেকে পুরুষের সমান বলে এই বিধিতে উল্লেখিত হয়েছে। এই বিধি অনুযায়ী মহিলারা যজ্ঞ করার অধিকারিণী।

বিধিতে বলা হয়েছে যে, জাতিভেদের ভিত্তিতে অস্পৃশ্যতা কোনোদিনই ও কোনোভাবেই বৈদিক সংস্কৃতি ও পরম্পরার অংশ নয়। হাজার বছরেরও বেশি সময়ব্যাপী পরাধীনতার পরিণাম এই জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা। মন্দিরে তপশিলি জাতি ও উপজাতির মানুষদের অবাধ প্রবেশাধিকার থাকবে। ধর্মান্তরিত এবং অন্যান্য মতাবলম্বীদের পরাবর্তন (বা ঘর-ওয়াপসি)-এর পদ্ধতি সহজতর করার বিষয়টিও লিপিবদ্ধ হয়েছে এই বিধিতে। হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে সহজ পদ্ধতির উপস্থাপনা করে এই বিধিতে বলা হয়েছে, যে কেউ হিন্দুধর্মের অনুসারী হতে পারেন, কারণ শাস্ত্রানুযায়ী সকলেই জন্মসূত্রে হিন্দু। বিভিন্ন পুরাণ, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ও বিভিন্ন শাস্ত্র হতে উদাহরণ এবং নীতি-নির্দেশ সংগ্রহ করে রচিত এই আদর্শ আচরণবিধি 'নিষ্কাম কর্মযোগ'-এর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মানের মধ্যে অন্যতম পদ্ম পুরস্কার। তিনটি ভাগ রয়েছে এই সম্মানের— পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ ও পদ্মশ্রী। কলা, সংগীত, সামাজিক কাজ,

বিজ্ঞান, চিকিৎসা, আধ্যাত্মিকতা, সাহিত্য, শিক্ষা, খেলা, নাগরিক জীবন ও সেবাকাজের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য এই সম্মান দেওয়া হয়। গত ২৫ জানুয়ারি, সাধারণতন্ত্র দিবসের ঠিক একদিন আগে ২০২৫ সালের পদ্ম পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় সরকার। ১১৩ জন পদ্মশ্রী পুরস্কার পাচ্ছেন এবার। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে এ বছর পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত হতে চলেছেন নয় জন। গোটা দেশ থেকে পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত হতে চলেছেন ১৯ জন, পদ্মবিভূষণ পুরস্কার পাবেন সাত জন। পশ্চিমবঙ্গের পদ্মশ্রী প্রাপকরা হলেন স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ (আধ্যাত্মিকতা ও সেবাকাজ), তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার (সরোদবাদক),মমতাশঙ্কর (নৃত্যশিল্পী-অভিনেত্রী), গোকুলচন্দ্র দাস (ঢাকবাদক), অরিজিৎ সিংহ (গায়ক), নগেন্দ্রনাথ রায় (সাহিত্যিক-শিক্ষাকর্মী), সজ্জন ভজনকা (শিল্পপতি-ব্যবসায়ী), পবন গোয়েঙ্কা (শিল্পপতি) ও বিনায়ক লোহানি (সমাজকর্মী)।

শোক সংবাদ

মালদা নগরের স্বয়ংসেবক অধুনা হুগলী জেলার কোন্নগর নিবাসী কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী গত ২৫ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। তিনি তাঁর কন্যা-জামাতা, দুই নাতি-সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধকে রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি বাল্যকালে তৎকালীন প্রচারক বংশীলাল সোনীর হাত ধরে মালদা নগরের কালীতলা শাখার স্বয়ংসেবক হন। একসময় তিনি দক্ষিণ কলকাতার সঙ্ঘের কার্যবাহের দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৭৫ সালে জন সংঘর্ষ সমিতির মালদা জেলা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে কারাবরণ করেন। দীর্ঘদিন তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের হুগলী জেলা সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

নেতাজীর মৃত্যুদিন ঘোষণা লোকসভার বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ২৩ জানুয়ারি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিনে সকাল ৯টা ৮ মিনিটে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী তার এক্স-হ্যান্ডলে একটি বিতর্কিত পোস্ট করেন। সেই পোস্টে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ছবির নীচে জন্মতারিখ এবং 'মৃত্যুর তারিখ', দুই-ই লেখা ছিল। নেতাজীর মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ করার কারণে নেতাজীর জন্মদিনে তিনি তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর পরিবর্তে অপমান করেছেন বলে অভিযোগ করেন বহু জাতীয়তাবাদী, দেশপ্রেমিক মানুষ। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ১২৮তম জন্মবার্ষিকীতে লোকসভার বিরোধী দলনেতার এই পোস্টে নেতাজীর মৃত্যুর তারিখের উল্লেখের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন। ফরোওয়ার্ড ব্লক রাহুল গান্ধীকে 'অর্বাচীন' আখ্যা দিয়েছে। ইন্ডিজোট সঙ্গী তৃণমূল কংগ্রেসও তাদের জোটের নেতা রাহুল গান্ধীর সমালোচনা করেছে। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার অবশ্য ২৩ তারিখ অনেক বেলা পর্যন্তও 'দেখে উঠতে পারেননি'

রাহুল গান্ধীর পোস্ট। পোস্টে কী লেখা রয়েছে, তা জানানোর পর তিনি তির ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন নেতাজীর পরিবারের দিকে। বলেছেন, 'সুগত বসু এ বিষয়ে কী বলছেন, জেনে নিন।' প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালেও নেতাজী জয়ন্তীতে রাহুল গান্ধী একই কাজ করেছিলেন। এদিন তার পোস্টে নেতাজীর মৃত্যুদিন হিসেবে লেখা রয়েছে ১৮ আগস্ট, ১৯৪৫। অর্থাৎ, তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর তথাকথিত ও বিতর্কিত তারিখটিই তিনি লিখেছেন। নেতাজী অন্তর্ধান রহস্যের সমাধান খুঁজতে গঠিত বিভিন্ন কমিশনের কোনোটিই ওই তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর কোনো অকাট্য প্রমাণ দিতে পারেনি। রাহুল গান্ধী কীসের ভিত্তিতে এই তথ্য জানালেন সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাকে অবিলম্বে ক্ষমা চাইতে হবে বলে দাবি করেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, 'লোকসভার বিরোধী দলনেতা নিজের পোস্টে যেভাবে নেতাজীর মৃত্যুদিন ঘোষণা করে দিয়েছেন, তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও দুঃখজনক। নেতাজী অন্তর্ধান রহস্যের সমাধান করার জন্য একাধিক কমিশন গঠিত হয়েছে। শেষ যে কমিশন মত দিয়েছে, সেই অনুযায়ী ওই দিনটি নেতাজীর মৃত্যুদিন নয়। তারপরেও লোকসভার বিরোধী দলনেতার পদে বসে থাকা ব্যক্তি যে কাজ করলেন, তা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। গোটা দেশের কাছে রাহুল গান্ধীর ক্ষমা চাওয়া উচিত।'

ইংরেজি বছরের প্রথম দিনে ছিল বড়ো নাশকতার ছক পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ২২ ডিসেম্বর জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর যৌথ অভিযানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থেকে গ্রেপ্তার হয় জাভেদ মুন্সি নামের এক কাশ্মীরি জঙ্গি। নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন তেহরিক-উল-মুজাহিদিনের সদস্য হলো এই জাভেদ মুন্সি। পাকিস্তানে গিয়ে সে জঙ্গি প্রশিক্ষণ নিয়েছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার নির্দেশে সীমান্ত পেরিয়ে সে বাংলাদেশে প্রবেশের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। দেশে একাধিক সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনায় সে যুক্ত হওয়া ছাড়াও সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে অনেক বার জেলও খেটেছে জাভেদ। পাকিস্তানি পাসপোর্ট ব্যবহার করে নেপাল, বাংলাদেশ, পাকিস্তানে বহু বার গিয়েছে সে। জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে যে অস্ত্র পাচারের সঙ্গে যুক্ত থাকার পাশাপাশি এই জেহাদি একজন বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ। গ্রেপ্তারের পর তাকে আলিপুর আদালতে তোলা হলে আদালত তাকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ট্রানজিট রিমান্ড দেয়। এই সংক্রান্ত তদন্তের অগ্রগতির জন্য জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ এই রিমান্ডে তাকে শ্রীনগরে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি পায়।

ইংরেজি বছরের প্রথম দিনে মালদা, মুর্শিদাবাদের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্রে নাশকতার ছক কষেছিল বাংলাদেশি জঙ্গি সংগঠন আনসারুল্লাহ বাংলা টিম। অসম পুলিশের বিশেষ গোয়েন্দা দল এসটিএফ এই পরিকল্পনার সন্ধান করে। গত ৩০ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদের নওদা থেকে গ্রেপ্তার হওয়া জঙ্গি সাজিবুল ইসলামকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই পরিকল্পনার কথা জানতে পারে।

মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারি-সহ মালদার পর্যটন কেন্দ্রকে জঙ্গিরা বেছে নেয়। ইংরেজি বছরের প্রথমদিনে বড়ো সংখ্যায় ভিড় জমায়েত হয় এই সব জায়গায়, সেই মতো নাশকতার পরিকল্পনা করে জঙ্গি সংগঠন। এই পরিকল্পনা হয় গত অক্টোবরে বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার সীমাবর্তী এক গ্রামে। তাতে জঙ্গি সংগঠনের প্রধান জসিমুদ্দিন রহমানি বিভিন্ন জনকে দায়িত্ব দেয়। সাজিবুল ইসলামের দায়িত্ব ছিল মহিলাদের মধ্যে সংগঠন বিস্তার ও উত্তর-পূর্ব ভারতে ফান্ড সংগ্রহ। আব্বাস আলির কাজ ছিল আত্মঘাতী মডিউলের জন্য সদস্য বাছাই এবং আইএস-এর কাছে আগ্নেয়াস্ত্র প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। মনিরুল শেখের কাজ ছিল মজহবি শিক্ষার নামে যুবকদের সংগঠনে সম্মিলিত করা। মুস্তাকিনের কাজ ছিল সংগঠনের স্থানীয় নেটওয়ার্ক এবং সাজিবুলের অনুপস্থিতিতে সম্পর্ক ধরে রাখা। এখনও পর্যন্ত সাজিবুল, আব্বাস, মনিরুল, মুস্তাকিন-সহ বেশ কয়েকজন জঙ্গি ধরা পড়েছে। মুর্শিদাবাদ, মালদা, দিনাজপুর ও নদীয়াতে অতিরিক্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা প্রশাসনের পক্ষ থেকে করা হয়েছে। সীমান্তেও কড়া নিরাপত্তা রয়েছে।

পূর্বতন অ্যাপল কর্ণধারের সহধর্মিণী নিরঞ্জনী আখড়ায় দীক্ষিত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক সংস্থা 'অ্যাপল'-এর কর্ণধার স্টিভ জোবস্ ২০১১ সালে প্রয়াত হন। তাঁর সহধর্মিণী লরিন পাওয়েল জোবস্ হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। গত ১০ জানুয়ারি, লরিন পাওয়েল ভারতে আসেন এবং তাঁর গুরুদেব, নিরঞ্জনী আখড়ার আচার্য মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী কৈলাসানন্দ গিরি মহারাজকে দর্শন করেন। নিরঞ্জনী আখড়া লরেন পাওয়েলের নামকরণ করে 'কমলা'।

গত ১১ জানুয়ারি কৈলাসানন্দ গিরি মহারাজ বারাণসীতে কাশী বিশ্বনাথ মন্দির দর্শন করেন। তাঁর সঙ্গে ভগবান বিশ্বনাথকে দর্শন করেন লরিন পাওয়েল। এই নিয়ে লরিন পাওয়েল দ্বিতীয় বার ভারত ভ্রমণে এলেন। প্রয়াগে অনুষ্ঠিত পূর্ণমহাকুম্ভে যোগদান, ভারতীয় সংস্কৃতি ও পরম্পরা বিষয়ে জ্ঞানার্জন এবং ধ্যানসাধনা তাঁর এই ভারত সফরের উদ্দেশ্য। কুম্ভস্নান ও মেলার প্রারম্ভে ভগবান বিশ্বনাথকে দর্শন করে দেবাদিদেবের কাছে বাধা-বিঘ্নহীন, বিপর্যয়মুক্ত পূর্ণমহাকুম্ভের প্রার্থনা জানান পূজনীয় মহারাজ। গত ১৪ জানুয়ারি, মকর সংক্রান্তির দিন মহাকুম্ভের প্রথম অমৃতস্নানে নিরঞ্জনী আখড়ার বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বা পেশোয়াইয়ের নেতৃত্বদান করেন মহারাজ। তিনি জানান যে, নিরঞ্জনী আখড়ার নতুন মহামণ্ডলেশ্বর হতে চলেছেন একজন আমেরিকান— মহর্ষি ব্যাসানন্দজী মহারাজ।

দীঘার জগন্নাথ মন্দির 'অরাজকতা' : শঙ্করাচার্য

হীরক কর॥ দীঘার নতুন জগন্নাথ মন্দির 'অরাজকতা' ছাড়া কিছুই নয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না করে তিনি বলেন, যারা এই অরাজকতা করছেন তাঁরা এর ফল পাবেন বলে অভিহিত করেন পুরীর শঙ্করাচার্য স্বামী নিশ্চলানন্দ সরস্বতী মহারাজ। এবার গঙ্গাসাগর মেলায় তাঁর আশ্রমে বসে কথা হচ্ছিল পুরীর শঙ্করাচার্যের সঙ্গে। তিনি বলেন, অনুকৃতি যেন অরাজকতার রূপ না ধারণ করে। পুরী তো পুরীই। নকল হচ্ছে নকলই। তাই, আক্কেল থাকা দরকার। অভিনয় করে অনেকেই রাম-সীতা হয়। কিন্তু তাই বলে কী তারা বাস্তবে সীতা-রাম হবে।

তাঁর অভিমত, এখনকার রাজনৈতিক নেতাদের শাসন করার ক্ষমতা নেই। ব্যবসায়ীরা এখন দেশ চালাচ্ছেন। মাত্র তেরো জন ব্যবসায়ী সারা বিশ্ব চালাচ্ছে। রাজনৈতিক নেতাদের আগে রাজদণ্ড, অর্থনীতি, দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে অভিহিত হতে হবে। রাজনৈতিক নেতাদের সনাতন শাস্ত্র অনুযায়ী দেশ চালাতে হবে। পুরীর শঙ্করাচার্য কথা প্রসঙ্গে বলেন, মানব নির্মিত বিশ্বের প্রথম রাজধানী অযোধ্যা। বিশ্বের মধ্যে হিন্দুত্ব সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম। মহম্মদ, এমনকী যিশুখ্রিস্টের আগে হিন্দু সমাজ ছিল। ফলে, মুসলমান ও খ্রিস্টান সকলে হিন্দুত্ব থেকেই এসেছেন। হিন্দু ও হিন্দুত্বের রক্ষা হলেই পুরো বিশ্ব রক্ষা হবে।

ইতিমধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গাসাগর মেলাকে 'জাতীয় মেলা' হিসেবে ঘোষণা করার দাবি জানিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে নিশ্চলানন্দ সরস্বতীর মত, 'সাগরমেলা' অনেক আগে থেকেই 'জাতীয় মেলা'। তিনি বলেন, জাতীয় মেলা না হলে আমি কেন এখানে প্রতি বছর আসতাম। ৩০ বছর ধরে আমি এখানে আসছি। ক্রমশ ভেঙে চলেছে সাগর তট। সমুদ্র ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। কপিলমুনির আশ্রমের দিকে।

শঙ্করাচার্যের ধারণা, বিকাশ অর্থাৎ উন্নয়নের নামে অবাধে বৃক্ষছেদন চলছে। কোনো মানুষই জলবায়ুর কথা চিন্তা করে না। বৃক্ষ নিধনের ফলে গঙ্গা, সমুদ্র দূষিত হচ্ছে। তাই উন্নয়নকে পরিভাষিত করতে, অর্থাৎ উন্নয়নকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে সনাতন শাস্ত্রের দরকার। না হলে বিকাশের নামে বিনাশ হবে।